বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা
মঞ্জুর-ই-খোদা

আগস্ট, ২০০৮

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
প্রগ্রেস টাওয়ার (৪র্থ-৭ম তলা)
বাড়ি # ১, সড়ক # ২৩, গুলশান -১, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন: ৮৮০-২-৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

উপদেষ্টা

প্রফেসর মোজাফ্‌ফর আহমদ
চেয়ারম্যান, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

এম. হাফিজউদ্দিন খান
কোষাধ্যক্ষ, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ড

তত্ত্বাবধানে

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

শাহজাদা এম আকরাম
ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, টিআইবি

গবেষণা ও প্রতিবেদন রচনা

মঞ্জুর-ই-খোদা
সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা, টিআইবি

তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা সহযোগিতা:

আব্দুর রাজ্জাক, মাইনুদ্দিন হাসান শাহেদ, জয়নাল আবেদীন, ফখরে আলম, বাবুল সরদার, মেহেদী হাসান, মো. আল মামুন, এম এ কোরেশী শেলু, আলমগীর সিদ্দিক, আমীর হাসান আমু, মো. নুরুল ইসলাম, কবীর হোসেন সিদ্দিকী, মো. শামসুল আলম, নিজামুল হক বিপুল, দীপু সারওয়ার, রকীব উদ্দিন, শামছুজ্জামান শাহীন।

বিশেষ সহযোগিতা:

সাধন কুমার দাস, সোহেল আহমেদ, নকীব রাজিব আহমেদ, মোরশেদা আকতার, নাহিদ শারমিন, নীনা শামসুন নাহার, রুমানা শারমিন।

কৃতজ্ঞতা:

জাকির হোসেন খান, মো. রেযাউল করিম, দিপু রায়, লিপি আমেনা, হাবিবুর রহমান, শাহনুর রাহমান, আতিয়া আফরিন, শহিদুল ইসলাম, মাকসুদা আকতার, জুলিয়েট রোজেটি, শাম্মি লায়লা ইসলাম, ফাতেমা আফরোজ।

যোগাযোগ:

manzoor@ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এমন এক সমাজ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন হবে দুর্নীতিমুক্ত এবং জনগণের সেবা দানে নিয়োজিত সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হবে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক। এই প্রত্যাশা নিয়ে টিআইবি দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণমূলক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ১৯৯৬ সাল থেকে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে আসছে।

বন দেশের অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। দেশকে মানুষের বাসযোগ্য করে রাখায় বন ও বনাঞ্চলের ভূমিকাই প্রধান। জাতীয় অর্থনীতি ও পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন, এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা – উভয় ক্ষেত্রেই এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য যেখানে দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি প্রয়োজন সেখানে বাংলাদেশের মোট ভূমির ১০ শতাংশের নিচে বনাঞ্চল রয়েছে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত বন উজাড় হওয়ার কারণে বনজ সম্পদকে এদেশের সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন ও ক্ষতিগ্রস্ত একটি খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বন উজাড় হওয়ার বিভিন্ন কারণের মধ্যে বন প্রশাসনের নানাবিধ দুর্বলতা ও বন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি ব্যাপকভাবে আলোচিত। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ প্রকাশিত *করাপশন ডাটাবেজ ২০০৪ ও ২০০৫* অনুসারে উভয় বছরেই বনবিভাগ 'অধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত' হিসাবে চিহ্নিত হয়।

এই প্রেক্ষিতে বন বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে বিদ্যমান অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা, এবং এসব বনাঞ্চলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি করার অভিপ্রায়ে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। টিআইবি'র সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা মঞ্জুর-ই-খোদা এই গবেষণাটি পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন। এই গবেষণায় বন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান নানাবিধ সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র ফুটে উঠেছে। গবেষণাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে বন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাছ থেকে সক্রিয় সাড়া ও সহায়তা পাওয়া গেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের কাঠ ব্যবসায়ী, বাওয়ালী, জেলে এবং বনের ওপর প্রতিনিয়ত নির্ভরশীল অনেকেই বর্তমান গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে আন্তরিক সহায়তা দিয়েছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এছাড়া টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সংশ্লিষ্ট সচেতন নাগরিক কমিটির সম্মানিত সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, মাইনুদ্দিন হাসান শাহেদ, জয়নাল আবেদীন, ফখরে আলম ও বাবুল সরদার এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করেছেন, যার জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

টিআইবি'র ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা শাহজাদা এম আকরাম এই গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই গবেষণাটি সমৃদ্ধ করতে টিআইবি'র গবেষণা বিভাগের সহকর্মীসহ অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়াও প্রাক্তন সহকর্মী সাইদুর রহমান মোল্লা এই গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রেখেছেন, তাকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরামর্শের জন্য তার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণার ফলাফলের আলোকে বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই এই খাতের সমস্যা দূর করে বন বিভাগকে আরও দক্ষ করে তুলতে পারলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনাদের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

সার-সংক্ষেপ i

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ১

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ৫

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ৬

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি ৬

১.৫ সংগৃহীত তথ্যের উৎস ৬

১.৬ গবেষণার এলাকা ৬

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ৬

দ্বিতীয় অধ্যায়: বন ব্যবস্থাপনার ইতিহাস ও বর্তমান কাঠামো

২.১ বনবিভাগ সৃষ্টির ইতিহাস এবং ক্রমবিকাশ ৭

২.২ বনের ধরন ও আয়তন ১০

২.৩ বন ব্যবস্থাপনায় গৃহীত নীতি ও আইন সমূহ ১৩

২.৪ বনবিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ১৫

২.৫ রাজস্ব আয় ১৬

তৃতীয় অধ্যায়: বনবিভাগে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র

৩.১ দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন ১৮

৩.২ সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে কাঠ চুরি ও পাচারে সহযোগিতা ১৮

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল হতে কাঠ চুরির ইতিহাস ১৮

কাঠ চুরির ক্ষেত্রে জোত পারমিট ও ট্রানজিট পাশের ভূমিকা ১৯

জোত পারমিট ও ট্রানজিট পাশ ১৯

জোত পারমিট ও ট্রানজিট পাশ ইস্যুর প্রক্রিয়া ১৯

প্রতিমাসে সম্ভাব্য ইস্যুকৃত জোত পারমিটের সংখ্যা ২০

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান অঞ্চলে কাঠ চুরি ও পাচারের প্রক্রিয়া ২১

কাপ্তাই অঞ্চলের কাঠ পাচারের রুট ২৩

লামা, আলীকদম, নাইক্ষংছড়ি ও চকরিয়া অঞ্চল হতে কাঠ চুরি ও পাচার প্রক্রিয়া ২৪

মৌলভীবাজার অঞ্চল হতে কাঠ পাচার প্রক্রিয়া ২৫

হবিগঞ্জ অঞ্চল হতে কাঠ পাচার প্রক্রিয়া ২৭

সুন্দরবন হতে কাঠ পাচারের প্রক্রিয়া ২৯

৩.৩ অবৈধ কাঠ ব্যবহার ও পাচারে স'মিলের ভূমিকা ৩১

৩.৪ কাঠ পাচারে ফার্নিচার দোকানের ভূমিকা ৩৩

৩.৫ বনজ সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত সংগ্রহে বনবিভাগের ভূমিকা ৩৪

৩.৫.১	সুন্দরবন হতে গোলপাতা ও গরান সংগ্রহে অনিয়ম	৩৪
৩.৫.২	সুন্দরবনে জেলেদের মাছ সংগ্রহে অনিয়ম	৩৫
৩.৫.৩	সুন্দরবন হতে মধু সংগ্রহে অনিয়ম	৩৮
৩.৬	সুন্দরবনে ডাকাতের উপদ্রব	৩৯
৩.৭	বনবিভাগে নিলাম প্রক্রিয়া ও সংশিষ্ট অনিয়ম	৪০
৩.৮	বন মামলা সংক্রান্ত অনিয়ম	৪১
৩.৯	বনবিভাগে নিয়োগ, পদায়ন এবং বদলিতে অনিয়ম	৪৩
৩.১০	প্রকল্প সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি	৪৫
৩.১১	বনবিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনভূমি জবর দখল	৪৮
৩.১২	বন নীতি ও বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন	৫২
৩.১৩	তথ্য প্রদানে অনীহা ও অসহযোগিতা	৫৩
চতুর্থ অধ্যায়: উপসংহার		
৪.১	সুপারিশমালা	৫৪
	গ্রন্থপুঞ্জী	৫৬
	পরিশিষ্ট	৫৮

সার-সংক্ষেপ

প্রেক্ষাপট

বন নবায়নযোগ্য বা পুনরুৎপাদনশীল প্রাকৃতিক সম্পদ। পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে রাখায় বন ও বনাঞ্চলের ভূমিকাই প্রধান। বায়ুমন্ডলের আর্দ্রতা বৃদ্ধি ও তাপের সমতা রক্ষা, বন্যা ও প্লাবন রোধ, ভূমির ক্ষয়রোধ, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস রোধ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণের মাধ্যমে বায়ু বিশুদ্ধকরণ, বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন সরবরাহ, মরুবিস্তার রোধ, পশুপাখির আশ্রয়স্থল সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতি এবং পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন ও ভারসাম্য রক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই এর গুরুত্ব ও প্রয়োজন অপরিসীম। ২০০৬-০৭ সালে বাংলাদেশের জিডিপি'র ১.৫২ শতাংশ আসে বন থেকে।

বন বিভাগ প্রদত্ত তথ্যানুসারে, বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ২.৫২ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি রয়েছে, যা দেশের মোট ভূমির প্রায় শতকরা ১৭.৪ শতাংশ। বন বিভাগ বর্তমানে দেশের ১০.৩০ শতাংশ বা ১.৫২ মিলিয়ন হেক্টর ভূমি নিয়ন্ত্রণ করছে। এর মধ্যে রয়েছে পাহাড়ি বন, সমতল ভূমির বন, সুন্দরবন, উপকূলে তৈরি করা বন এবং চা ও রাবার বাগানে সৃষ্ট বন। অবশিষ্ট ০.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর জুড়ে রয়েছে জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল এবং ০.২৭ মিলিয়ন হেক্টর গ্রামীণ বন। তবে ২০০৫-২০০৭ সালে এফএও এর সহযোগিতায় বন বিভাগ ও স্পার্সোর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই জরিপ অনুযায়ী দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ১.৪৪২ মিলিয়ন হেক্টর যা দেশের মোট ভূমির ৯.৮%।

প্রতিনিয়ত বন উজাড় হওয়ার কারণে বনজ সম্পদকে এদেশের সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন ও ক্ষতিগ্রস্ত একটি খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮০ সালের দিকে এদেশে প্রতি বছর ৮,০০০ হেক্টর জমির বন উজাড় হতো, যা বর্তমানে প্রতি বছর ৩৭,৭০০ হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে। একটি বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকের সূত্র মতে, বর্তমানে বন উজাড়ের হার ৩.৩। মাথাপিছু বনভূমির আয়তন ১৯৬৯ সালের ০.০৩৫ হেক্টর থেকে ১৯৯০ এ এসে কমে ০.০২ হেক্টরে দাঁড়ায়। বন ধ্বংসের কারণে ভূমির পানি ধারণ ক্ষমতা ও পানি ধারণ এলাকা কমে যায়, ভূমির ক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পড়ে যার পরিমাণ ১৯৯০ এ ছিল জিডিপির ১ শতাংশ।

বন বিনাশের নানাবিধ কারণের মধ্যে বন প্রশাসনের নানাবিধ দুর্বলতা, যেমন দক্ষ জনবলের অভাব, প্রয়োজনীয় বাজেট ও লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব, বন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রভৃতি মুখ্য কারণ হিসেবে বিভিন্ন প্রতিবেদনে আলোচিত হয়েছে। প্রায়শ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীর নানা ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম, যেমন অবৈধ কাঠ পাচারে সহযোগিতা, আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে নামমাত্র মূল্যে উদ্ধারকৃত চোরাইকাঠের নিলাম, বনজ সম্পদ আহরণকারীদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ আদায়, সরকারি রাজস্ব আত্মসাৎ, বন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ, পোস্টিং ও বদলির ক্ষেত্রে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের খবর পাওয়া যায়। দুর্নীতির কারণে সরকারের এ বিভাগের ভাবমূর্তি জনগণের কাছে বিতর্কিত।

বাংলাদেশে ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সংরক্ষণে ও বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত বনবিভাগে বিদ্যমান অনিয়ম এবং দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা সম্পর্কিত কোনো বাস্তবভিত্তিক গবেষণা ইতোপূর্বে করা হয়নি। প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের সংরক্ষণ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনায় বনবিভাগে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়ম দূরীকরণের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এই সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করে। বর্তমান গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বন বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে বনজ সম্পদ আহরণে বিদ্যমান অনিয়ম সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন।

এই গবেষণায় মূলত গুণগত (Qualitative) তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং প্রকাশনা থেকে বন বিভাগের বিভিন্ন সমস্যা ও দুর্নীতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কাঠ ব্যবসায়ী, স'মিলের মালিক ও কর্মচারী, অবৈধ কাঠ বহনকারী পরিবহণের চালক ও শ্রমিক এবং জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এ গবেষণা ডিসেম্বর ২০০৬ থেকে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য

মূলত দেশের পরিবেশগত ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও বনাঞ্চলসমূহের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সঠিক নিয়মে বনজ সম্পদ আহরণ ও রাজস্ব আদায় বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তবে সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের পরিবর্তে বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বন বিভাগে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে কাঠ চুরি ও পাচারে সহযোগিতা, স'মিল কর্তৃক অবৈধ কাঠ ব্যবহার ও পাচারে সহযোগিতা, ফার্নিচার দোকান কর্তৃক অবৈধ কাঠ ব্যবহার ও পাচারে সহযোগিতা, মাত্রাতিরিক্ত বনজ সম্পদ সংগ্রহে সহযোগিতা, আদায়কৃত সরকারি রাজস্ব আত্মসাৎ, সুন্দরবনে ডাকাত

নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, বনজ সম্পদ নিলামে বিক্রির ক্ষেত্রে অনিয়ম, বন মামলা দায়ের ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অনিয়ম, বনবিভাগে নিয়োগ, পদায়ন বা পোস্টিং এবং বদলির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি, প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম, বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনভূমি অবৈধ দখলে সহযোগিতা, বন নীতি ও বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন, তথ্য প্রদানে অনীহা ও অসহযোগিতা অন্যতম।

সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে কাঠ সংগ্রহ ও পাচার

দেশের বনাঞ্চলগুলোতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অন্যতম প্রধান ধরন হচ্ছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে অবৈধভাবে কাঠ সংগ্রহ ও পাচার। এর ফলে দেশের বনাঞ্চল একদিকে যেমন উজাড় হচ্ছে, তেমনি সরকার বঞ্চিত হচ্ছে প্রাপ্য রাজস্ব থেকে। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাঠ সংগ্রহ ও পাচার করার ক্ষেত্রে জোত পারমিটকে অবৈধ ভাবে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে চোরাই কাঠ পাচারের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে একটা বৈধতার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয় অর্থাৎ ভুয়া জোত পারমিটের কাগজ তৈরি করে জোত পারমিটের আড়ালে সংরক্ষিত বনের কাঠ চুরি করা হয়। তেমনি ভাবে চোরাই কাঠ জেলার বাইরে পাচারের জন্য ট্রানজিট পাশ ব্যবহার করা হয়। তবে কোনো ধরনের কাগজপত্র ছাড়াই কাঠ পাচারের ঘটনাও ব্যতিক্রম নয়।

অবৈধ কাঠকে জোত পারমিটের আড়ালে বৈধ রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে স্থানীয় জোতের মালিকের কাছ থেকে জমির দলিল ও ছবি নিয়ে জোত পারমিটের জন্য আবেদন করা হয়। অবৈধ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট জোতের দলিল সংশ্লিষ্ট এলাকার কারবারী ও হেডম্যান কর্তৃক সত্যায়িত করা হয়। ডিসি অফিস ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট জোতে যেয়ে দলিল ও অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে জোত পারমিট ইস্যু করার কথা থাকলেও সাধারণত তা করা হয় না। ডিসি অফিসে এবং বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে কোনো তদন্ত ছাড়াই জোত পারমিট ইস্যু করিয়ে নেওয়া হয়।

অন্যদিকে একদল কাঠ কাটার শ্রমিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সংরক্ষিত বনে যেয়ে কাঠ কেটে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করে রাখে। পরে পাহাড়ী ধোলাই শ্রমিক ও লোড শ্রমিকের সহায়তায় ঐ সকল কাঠ নদী পথে ট্রলার বা নৌকায় করে অথবা চালি করে বা ভুর সাজিয়ে শহরে নিয়ে আসা হয়। এক্ষেত্রে সংরক্ষিত বনের সংশ্লিষ্ট বনরক্ষী ও বন বিভাগের বিভিন্ন চেকপোস্টে ঘুষ দিতে হয়। এছাড়া পাহাড়ী সংগঠন জেএসএস ও ইউপিডিএফ উভয় পক্ষকেও চাঁদা দিতে হয়।

এভাবে চোরাই কাঠ শহরে নিয়ে আসার পর গোল ও রদ্দা হিসেবে শহর হতে পাচারের পূর্বে পুনরায় ডিসি অফিস (এলআরফান্ড), স্থানীয় থানা, প্রেসক্লাব, সরকারি দল, বিরোধী দল, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা প্রত্যেককে নির্দিষ্ট হারে চাঁদা দিতে হয়। এছাড়াও পথে বন বিভাগের প্রতিটি চেকপোস্টে এবং বিডিআর ও টহল পুলিশকেও ঘুষ দিতে হয়। জোত পারমিটের কাগজপত্র ছাড়া চোরাই কাঠ পাচার করার ক্ষেত্রে প্রতি স্থানে নিয়মিত হারের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ঘুষ দিতে হয়।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, একটি জোত পারমিটের আড়ালে সংরক্ষিত বন হতে গড়ে ১৫০০ সিএফটি কাঠ রাঙ্গামাটি শহরে পাচার করতে বন বিভাগ ও ডিসি অফিসসহ মোট ১৪ টি খাতে গড়ে প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা ঘুষ বা চাঁদা প্রদান করতে হয়। এই কাঠ ভর্তি ট্রাক রাঙ্গামাটি হতে চট্টগ্রাম শহরে পাচার করার ক্ষেত্রে পুনরায় বন বিভাগের বিভিন্ন চেকপোস্টসহ মোট ১৩ টি খাতে ট্রাক প্রতি গড়ে প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকা ঘুষ বা চাঁদা দিতে হয়। অর্থাৎ গড়ে ৪০০ সিএফটি বা এক ট্রাক কাঠ এই অঞ্চলের সংরক্ষিত বন থেকে চট্টগ্রাম শহরে পাচার করতে প্রায় ২৭ টি খাতে গড়ে প্রায় ৮৪ হাজার টাকা ঘুষ বা চাঁদা দিতে হয়। এই কাঠ ঢাকা শহরে পাচার করার জন্য অতিরিক্ত আরও প্রায় ৫০ হাজার টাকা ঘুষ বা চাঁদা দিতে হয়। এই এক ট্রাক কাঠের বাজারমূল্য প্রায় ৮ লক্ষ টাকা।

দেশের অন্যান্য বনাঞ্চলের মতো হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারেও সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে নিয়মিত কাঠ চুরি ও পাচার হয়। এসব অঞ্চলে ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গায় কাঠ কাটার জন্য বন বিভাগ থেকে পূর্ব অনুমতি বা 'হোম পারমিট' গ্রহণ করতে হয়। হোম পারমিট গ্রহণের প্রক্রিয়া পার্বত্য অঞ্চলের জোত পারমিট প্রদান প্রক্রিয়ার মতোই দীর্ঘ ও অস্বচ্ছ। হোম পারমিট গ্রহণে বন বিভাগকে নির্দিষ্ট অংকের টাকা ঘুষ দিতে হয়। হোম পারমিট নিয়ে গাছ কাটার পর তা পরিবহণের উদ্দেশ্যে টিপি গ্রহণ ও বিভিন্ন চেকপোস্ট পার হওয়ার জন্য পুনরায় বন বিভাগকে ঘুষ দিতে হয়।

সুন্দরবন সংলগ্ন খুলনা, বাগেরহাট, শরনখোলা, মংলা, পিরোজপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এলাকার বেশিরভাগ কাঠ ব্যবসায়ী বন বিভাগের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতায় প্রায় প্রতিনিয়ত সুন্দরীসহ বিভিন্ন মূল্যবান গাছের কাঠ পাচার করে আসছে। সুন্দরবনের কাঠ পাচারের সঙ্গে বন বিভাগের একশ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, স্থানীয় সাংবাদিক এবং স্থানীয় প্রশাসনের কতিপয় অসৎ কর্মকর্তা জড়িত।

বিভিন্ন কৌশলে সুন্দরবন থেকে দিনে-রাতে কাঠ পাচার করা হয়। সুন্দরবনের আশে পাশের এলাকায় বিশেষ করে মংলায় কিছু প্রভাবশালী কাঠচোর সিন্ডিকেট রয়েছে। এরা কম খরচে কাঠ চুরির জন্যে (একবার ব্যবহার উপযোগী) ট্রলার নির্মাণ করে, যাতে কাঠ পাচারের সময় আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়লে বা ট্রলার আটক হলে খুব বেশি লোকসান না হয়। তবে সংশ্লিষ্ট বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং পথে অবস্থিত পুলিশ স্টেশনগুলোর সাথে আগেই সমঝোতা থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না।

গাছ পাচারের অন্যতম অভিনব উপায় হচ্ছে 'ভুর'। এক্ষেত্রে সুন্দরী গাছ কেটে ভেলার মতো সাজানো হয়। তারপর গোলপাতা গাছের গোড়া বা 'মেড়' কাঠের উপরে দিয়ে কাঠ ভাসিয়ে দেয়া হয়। গোলের মেড় বা গোলপাতার গোড়ার সাথে কাঠ শক্ত করে বাঁধা থাকে। অমাবস্যার গোণে মাঝনদী, খাল দিয়ে 'ভুর' ভাসিয়ে দেয়া হয়। সাধারণত বর্ষার সময় এই ভুরের চালান বেশি যায়। মূলত বলেশ্বর, পশুর ও শিবসা এই তিনটি নদী দিয়ে এই ভুরের চালান বেশি পাচার হয়ে থাকে। পশুর নদী দিয়ে মরা পশুর, ভদ্রা ও হাড়বেড়িয়ার কাঠও পাচার হয়ে থাকে। বছরে প্রায় ছয় (৬) কোটি টাকার কাঠ এই তিনটি নদী দিয়ে ভুর হিসেবে পাচার করা হয়।

সুন্দরবন থেকে অবৈধ কাঠ পাচারের অন্যতম নিয়মিত মাধ্যম হচ্ছে গোলপাতা-গরানের নৌকা এবং জেলে নৌকা। জেলেদের মাছ ধরার সময়ে নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিছু জ্বালানি সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হয়। এই সুযোগে মাছ ধরে ফিরে আসার সময় জেলেরা অতিরিক্ত জ্বালানি বিক্রির জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। এছাড়া কিছু জেলে নৌকা সুন্দরবন থেকে গড়ে **১৫** সিএফটি সুন্দরী ও পশুর কাঠ চুরি করে নিয়ে আসে। অন্যদিকে বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে গোলপাতা ও গরানের নৌকায় জ্বালানি কাঠসহ গোলপাতার নিচে এবং গরানের সাথে অবৈধভাবে সুন্দরীসহ অন্যান্য মূল্যবান কাঠ পাচারেও কোনো সমস্যা হয় না। এভাবে প্রতি বছর গোলপাতা ও জেলে নৌকায় গড়ে প্রায় **১৩৫** কোটি টাকার কাঠ পাচার হচ্ছে।

এছাড়াও বন বিভাগের বিভিন্ন স্টেশন ও ক্যাম্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা স্থানীয় দরিদ্র গ্রামবাসীদের বেসরকারিভাবে অফিস লেবার হিসেবে নিয়োগ করে তাদের দ্বারা বনের বিভিন্ন স্থানে কাঠ কাটিয়ে লুকিয়ে রেখে সুযোগ বুঝে পাচার করে দেয়। বন বিভাগের বিভিন্ন অফিসে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবেও পানি সরবরাহকারী শ্রমিকদেরকে সুন্দরীসহ অন্যান্য কাঠ ও জ্বালানি কাঠ নেওয়ার সুযোগ দেয়া হয়।

অবৈধ কাঠ ব্যবহার ও পাচারে স'মিল ও ফার্ণিচার দোকানের ভূমিকা

অবৈধ কাঠের ব্যবহার ও পাচারে বন বিভাগের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন স্থানের স'মিলগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রাঙ্গামাটি সার্কেলে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে সংগ্রহকৃত অবৈধ বা চোরাই কাঠের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাঠ এই সকল স'মিলে চেরাই করে চেরাই কাঠ হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে চুরি করে আনা কাঠ বা কাগজবিহীন অবৈধ কাঠ কাটার জন্য বন বিভাগ, ডিসি অফিস ও স্থানীয় থানায় প্রতি স'মিল থেকে নির্দিষ্ট হারে মাসিক চাঁদা দিতে হয়। অনুরূপভাবে, বান্দরবানের স'মিলগুলোতে চেরাই করা কাঠের প্রায় ৮০% কাঠ সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়। লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়িতে বিভিন্ন স'মিলে যে কাঠ কাটা হয় তার ৮০% কাঠই সংরক্ষিত বন থেকে অবৈধভাবে সংগৃহীত। অন্যদিকে চকরিয়ার স'মিলগুলোতে যে কাঠ চেরাই করা হয় তার এক-তৃতীয়াংশ চোরাই কাঠ। একইভাবে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের বিভিন্ন স'মিলে চেরাইকৃত কাঠসমূহের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে স'মিল স্থাপনেও বন বিভাগকে এবং ডিসি অফিসকে ঘুষ হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়। অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে বন বিভাগের অননুমোদিত সীমার ভিতরেও স'মিল স্থাপন ও পরিচালনা করা হয়।

সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে অবৈধভাবে সংগৃহীত কাঠ পাচারে কিছু ফার্নিচার দোকানেরও ভূমিকা রয়েছে। বন বিভাগ, ডিসি অফিস ও পুলিশ প্রশাসনকে অবৈধ অর্থের বিনিময়ে ম্যানেজ করে এই সকল ফার্ণিচার দোকান চোরাই কাঠ ব্যবহার করে ও ফার্ণিচার পাচার করে থাকে। রাঙ্গামাটিতে বর্তমান ফার্নিচার দোকানগুলোর অর্ধেক দোকানই অবৈধ। বান্দরবানের ফার্নিচার দোকানগুলোর মধ্যে মাত্র **১০**টি দোকানের ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে। রাঙ্গামাটির এই সকল ফার্নিচারের দোকানে ব্যবহৃত কাঠের প্রায় ৯০% কাঠই সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়। অনুরূপভাবে, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির ফার্নিচারের দোকানগুলোতে প্রতি মাসে যে কাঠ প্রয়োজন হয়, তার অধিকাংশই সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে অবৈধভাবে সংগৃহীত কাঠ। বন বিভাগ ও পুলিশের সহযোগিতায় এই সকল ফার্নিচারের দোকান চালু রাখার জন্য এবং অবৈধ কাঠ ব্যবহারের জন্য বন বিভাগকে ও স্থানীয় থানাকে প্রতি দোকান হতে মাসিক চাঁদা দিতে হয়।

সরকারি নিয়মানুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বদলি হয়ে যাওয়ার সময় বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এক সেট নতুন ফার্নিচার নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে এই নিয়মের আড়ালে ডিসি অফিস ও বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ঘুষ দিয়ে **২-৩** সেট ফার্নিচার নিয়ে থাকেন। এছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রামের এক শ্রেণীর ফার্নিচার ব্যবসায়ী ডিসি অফিস থেকে ঘুষের বিনিময়ে টিপি সংগ্রহ করে এবং ফার্নিচার পাচার করে। অনেক সময় এই সকল টিপি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়। অনেকক্ষেত্রে ডিসি অফিস বন আইন না মেনে বন বিভাগকে পাশ কাটিয়ে এই টিপি ইস্যু করে থাকে।

মাত্রাতিরিক্ত বনজ সম্পদ সংগ্রহে বন বিভাগের ভূমিকা

সুন্দরবন হতে বিভিন্ন ধরনের বনজ সম্পদ অর্থাৎ গোলপাতা, গরান, মধু ও বিভিন্ন ধরনের মাছ সংগ্রহেও বন বিভাগের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট বনজীবীদের হয়রানির শিকার হতে হয়। বিভিন্ন ধরনের বনজ সম্পদ সংগ্রহে বনজীবীদের বন বিভাগ কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বন বিভাগ বনজ সম্পদের বিপরীতে রাজস্ব আদায় করে থাকে। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি দুর্নীতিপরায়ণ বন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিভিন্ন পর্যায়ে বনজীবীদের

নিকট হতে অতিরিক্ত অর্থ ঘুষ হিসাবে আদায় করে থাকে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী গোলপাতা সংগ্রহে বাওয়ালীদেরকে একটি ৫০০ মণী নৌকায় প্রতি ট্রিপে বিএলসিসহ প্রায় ৩১,৬২০ টাকা ফি বা চাঁদা দিতে হয়। এর মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা হয় মাত্র ২,১২০ টাকা। বাকি প্রায় ২৩,৫০০ টাকা বন বিভাগের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ৬,০০০ টাকা বনদস্যু ও পুলিশের কাছে যায়। স্বাভাবিকভাবেই এই অতিরিক্ত খরচ পুষিয়ে নেওয়ার জন্য মলম দেয়া নৌকায় করে বাওয়ালীরা নির্ধারিত অনুমোদন অপেক্ষা গড়ে চার গুণ পণ্য বেশি সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়। প্রতি বছর শুধুমাত্র বাওয়ালীদের নিকট হতে বিভিন্ন খাতে গড়ে প্রায় সোয়া ৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় করা হয়। অন্যদিকে এই অতিরিক্ত টাকার যোগান দিতে যেয়ে বাওয়ালীরা নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩২ লক্ষ মণ গোলপাতা বেশি সংগ্রহ করে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৩০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে সরকারের রাজস্ব লোকসান হয় প্রায় সোয়া কোটি টাকা।

সাধারণত সুন্দরবনের উৎপাদন ক্ষমতা ও সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিবছর গোলপাতাসহ অন্যান্য বনজ দ্রব্য আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বন বিভাগের একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতির কারণে প্রতিবছরই লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বনজ দ্রব্য সংগৃহীত হয়ে থাকে। এর ফলে একদিকে সরকার তার রাজস্ব হারায়, অন্যদিকে দুর্নীতিবাজ বন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবৈধ আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয় সুন্দরবন। অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অতিরিক্ত বনজ সম্পদ আহরণের কারণে সুন্দরবনের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

সুন্দরবনে জেলেদের মাছ সংগ্রহে অনিয়ম

সুন্দরবনের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকা বিশাল জলভাগ। এই এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ মানুষের অন্যতম প্রধান পেশা মাছ ধরা। সুন্দরবন অঞ্চলে গলদা ও বাগদা চিংড়ি, মাছের পোনা, কাঁকড়া, সাদা মাছ (পাঁচ মিশালী মাছ), জোংরা (এক ধরনের শামুক যা থেকে খাবার চুন তৈরি হয়) সংগ্রহ করা হয়। সুন্দরবন এলাকায় মাছ ধরার জন্য বন বিভাগকে নির্দিষ্ট হারে শুল্ক ও রাজস্ব দিতে হয়। তবে বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এই সকল জেলেদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত শুল্ক অপেক্ষা অতিরিক্ত চাঁদা আদায় করে।

সুন্দরবনের মাছ ধরা নৌকাগুলো সাধারণত গড়ে ৩৫ মণ ধারণ-ক্ষমতা-সম্পন্ন হয় যার বিএলসি'র বার্ষিক সরকারি ফি ১২ টাকা। কিন্তু এক্ষেত্রে ২০০ থেকে ২২০ টাকা আদায় করা হয়। অর্থাৎ প্রতিবছর প্রায় ১৬,০০০ নৌকা হতে বিএলসি খাতে অতিরিক্ত আদায় করা হয় গড়ে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।

অন্যদিকে বনে প্রবেশ করে মাছ ধরার সময় বিভিন্ন টহল ফাঁড়িতে গড়ে ২০০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। অনুরূপভাবে, মাছ ধরে ফিরে আসার সময় মাছের রাজস্ব হিসাবে প্রকৃত পরিমাণ হিসাব না করেই বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইচ্ছামতো রাজস্ব আদায় করা হয়। উপরন্ত আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ সরকারি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার সময়ে প্রকৃত সময় ও পরিমাণ কম দেখানো হয়। এভাবে প্রতি বছর জেলে নৌকা হতে গড়ে প্রায় ২৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় করা হয়।

বন বিভাগের এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তায় মৎস্য শিকারীদের মহাজনদের সাথে মোটা অঙ্কের আর্থিক চুক্তির বিনিময়ে বনের শেওলা, কটকা, কচিখালী, সুপতি, নিলকমল, দোবেকি, মান্দারবাড়িয়া, পুষ্পকাঠি, আলিবান্ধা, চরকি, তালবাড়িয়া অভয়ারণ্য এলাকায় মাছ শিকারের সুযোগ করে দেয়। নিষিদ্ধ এলাকাগুলোতেও নিয়মিত মৎস্য শিকারের ফলে মাছের প্রজনন ধ্বংস হতে চলেছে। অভয়ারণ্যের বিভিন্ন স্টেশন ও ফাঁড়িগুলোতে নৌকা প্রতি সপ্তাহে ২'শ থেকে ৩'শ টাকা উৎকোচ দিয়ে মাছ শিকার করে থাকে।

অনেক জেলে অতিরিক্ত মাছ সংগ্রহের লক্ষ্যে বনের অভ্যন্তরে নদী ও খালে বিষাক্ত সিমবুশ, রিপকট, ওস্তাদ প্রভৃতি কীটনাশক ছিটিয়ে চিংড়িসহ অন্যান্য প্রজাতির মাছ সংগ্রহ করতে যেয়ে মাছের ডিম ও পোনাসহ এর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে ইতোমধ্যে সুন্দরবনে মৎস্য শূণ্যতা দেখা দিয়েছে।

চিংড়ি পোনা শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে বন বিভাগ চিংড়ি পোনা ধরার জন্যে কোনো পাশ দেয় না। কিন্তু চিংড়ি পোনা আহরণ থেমে নেই। প্রতি সপ্তাহে চিংড়ি পোনা আহরণকারীকে নৌকা প্রতি ৪০ থেকে ৫০ টাকা উৎকোচ দিতে হয়। উৎকোচের টাকা বন বিভাগের স্টেশন অফিসগুলোর কর্মকর্তারা নেন। এর জন্য প্রতিটি স্টেশনে একাধিক আদায়কারীও রয়েছে।

সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহে অনিয়ম

সুন্দরবনের অন্যতম সম্পদ মধু। সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল বাওয়ালী ও জেলেদের একাংশ বন বিভাগ নির্ধারিত সময়ে সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে মধু সংগ্রহ করার পূর্বেই মধুর জন্য বন বিভাগ নির্ধারিত রাজস্ব জমা দিতে হয়। অন্যদিকে মধু সংগ্রহ করে ফিরে আসার সময় ঐ স্টেশনে নৌকা প্রতি প্রায় একমণ মধু ঘুষ হিসেবে দিতে হয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রতি বছর মৌয়ালদের নিকট থেকে বন বিভাগের কর্মকর্তারা প্রায় ৮ লক্ষ টাকার মধু উৎকোচ হিসেবে আদায় করে থাকে। এই মধু পরবর্তীতে প্রধান বন সংরক্ষক হতে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পর্যন্ত উপঢৌকন হিসেবে পাঠানো হয়।

সুন্দরবনে ডাকাতের উপদ্রব

সুন্দরবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে বনদস্যু বা ডাকাত। ছোট-বড় প্রায় ৩০টি ডাকাত দল সমগ্র সুন্দরবনকে দখল করে বন বিভাগের সমান্তরাল আরেকটি প্রশাসন গড়ে তুলেছে। এই ডাকাত দলকে চাঁদা না দিয়ে সুন্দরবন থেকে কোনো ধরনের বনজ সম্পদ আহরণ করা সম্ভব নয়। সাধারণত বাওয়ালী, মৌয়াল ও জেলেরা বনে প্রবেশের পূর্বেই ডাকাতদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। চাহিদা মোতাবেক চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হলে ডাকাতরা বাওয়ালী বা জেলেদের জিম্মি করে রাখে এবং নৌকায় লুটপাট চালায়। পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে জনপ্রতি গড়ে ৩০,০০০ টাকা মুক্তিপণ আদায় করে। ডাকাত দলকে প্রতিরোধ করতে যেয়ে তাদের হামলায় অথবা মুক্তিপণ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রতি বছর গড়ে ১০ জন জেলে-বাওয়ালী প্রাণ হারায়।

সুন্দরবনের অভ্যন্তরে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে বনজ সম্পদ সংগ্রহের সময় বনজীবীদের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব বন বিভাগ, কোস্ট গার্ড ও সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর। কিন্তু এদের সকলেই সুন্দরবনের ডাকাত প্রতিরোধে কার্যকর নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ।

ডাকাত নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে বন বিভাগ লোকবলের অভাব, প্রয়োজনীয় অস্ত্রের অভাব, অস্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতা, যানবাহনের অভাব, নিয়মিত টহল ও বিশেষ অভিযানে প্রয়োজনীয় জ্বালানির অভাব এবং নিরাপত্তার অভাবের কথা উল্লেখ করে। কোস্টগার্ডও ডাকাত দল নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় অর্থ, অস্ত্র ও যানবাহন সংকটের কথা উল্লেখ করে। তবে কোস্টগার্ড সদস্যদের বিরুদ্ধেও ডাকাত দলকে সহায়তা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ অভিযান পরিচালনার শুরুতেই কোস্টগার্ডের নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ডাকাত দলকে আগাম খবর দিয়ে সতর্ক করে দেয়।

বন বিভাগে নিলাম ও বন মামলা সংক্রান্ত অনিয়ম

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন বিভাগ কর্তৃক প্রতিমাসে প্রয়োজনানুযায়ী এক বা একাধিকবার বনজ সম্পদ বিক্রয়ের জন্য নিলামের ব্যবস্থা করা হয়। এই নিলামের ক্ষেত্রেও বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যে সকল অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে তার মধ্যে কাঠের গুণগত মান পরিবর্তন, প্রকৃত কাঠের পরিমাণ গোপন করা, নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সিন্ডিকেটকে নিলামের ডাক গ্রহণে সহায়তা প্রদান এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে সিন্ডিকেট গঠনে সহায়তা প্রদান অন্যতম।

বন আইনে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য মামলার ধরন সুনির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী মামলার ধরন পরিবর্তনের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করে থাকে। অপরাধীর সাথে গোপন সমঝোতার মাধ্যমে বন আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করে গুরুতর অপরাধকেও নিষ্পত্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে লিপিবদ্ধ করে অর্থাৎ পিওআর মামলার পরিবর্তে সিওআর মামলা করে থাকে। ফলে অপরাধী বিনা শাস্তিতে মুক্তি পেয়ে যায় এবং যৎসামান্য জরিমানা আদায়ের মাধ্যমে অবৈধভাবে সংগ্রহকৃত বনজ দ্রব্য ছাড়িয়ে নিয়ে থাকে।

বন আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে অবৈধভাবে সংগৃহীত কাঠ সংশ্লিষ্ট অবৈধ বা চোরাই কাঠ ব্যবসায়ীদের নিকট সিওআর মামলায় নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিক্রি করার নিয়ম নেই। কিন্তু রাঙ্গামাটি সার্কেলে এইভাবে ২০০৫ সালে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ সিএফটি চোরাই কাঠ সংশ্লিষ্ট কাঠ ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করায় সরকারের প্রায় সাড়ে ২৭ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়। এই অনিয়মের সাথে বন বিভাগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংসদের স্থায়ী কমিটির জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

বন আইনানুসারে বন মামলা দায়ের ও অপরাধ প্রমাণে বন কর্মকর্তার সাক্ষ্য যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। অসাধু বন কর্মকর্তা এই আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের এবং মামলার হুমকি দিয়ে অবৈধ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। অনেক সময় বন থেকে কাঠ বা বনজ দ্রব্য চুরি হলে বা কোথাও বন অপরাধ সংঘটিত হলে বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী অফিসের ফাইল পত্র ঘেঁটে অফিসে বসেই পূর্বের তালিকাভুক্ত দরিদ্র চোর বা স্থানীয় কোনো ব্যক্তির নামে নতুন মামলা দায়ের করে। অর্থাৎ একবার কারও নাম বন বিভাগের চোরের তালিকায় লিপিবদ্ধ হলে, পুনরায় অপরাধ না করলেও রেকর্ড পত্রের সূত্র ধরে তার নামে একাধিক মামলা করা হয়। অন্যদিকে মামলার খরচ বহন করার জন্যই সেই দরিদ্র ব্যক্তিটিও পুনরায় কাঠ চুরি করতে বাধ্য হয়। টাঙ্গাইল বন বিভাগ সংলগ্ন এলাকার অনেক আদিবাসীর বিরুদ্ধে ৮০-৯০টি মামলারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই এলাকায় হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেয়ায় মাত্র দেড় বছরে বন মামলার সংখ্যা ৭২৫২ হতে ১৫০ এ কমে এসেছে।

বন বিভাগের কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত বন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক বন আইন ও বন মামলার অপব্যবহারের কারণে সর্বত্র বন বিভাগের একটি নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বন বিভাগের কোনো সৎ কর্মকর্তা প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে সঠিক নিয়মে মামলা করলেও প্রশ্নের সম্মুখীন হন। মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলার আশংকায় প্রকৃত অপরাধীকে জামিন দেয়া এবং কখনও কখনও চূড়ান্ত বিচারের রায় দেয়ার ক্ষেত্রে আদালত অপরাধীর পক্ষে প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

বন বিভাগের অধিকাংশ পিওআর মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা একটা বড় সমস্যা। এই দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত আসামি বা অপরাধী বিনা শাস্তিতে ছাড়া পেয়ে যায়। মামলা দায়ের ও পরিচালনার জন্য অথবা কোনো মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য আইনজীবি নিয়োগে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দও থাকে না। আসামিকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য

খরচও বন বিভাগ থেকে বহন করা হয় না। কিন্তু সংঘটিত বন অপরাধ ও সংশ্লিষ্ট বন অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার সকল দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা-কর্মচারীকেই বহন করতে হয়। পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাবে এসব ক্ষেত্রে বন বিভাগের উচ্চপর্যায় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক কোন নির্দেশনা না দিয়ে মৌখিক পরামর্শের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে 'ম্যানেজ' করার জন্য বলা হয়। এই 'ম্যানেজ' করার প্রক্রিয়া থেকেই দুর্নীতির উদ্ভব।

বন বিভাগে নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি ও বদলিতে অনিয়ম

বন বিভাগের অনিয়মসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর অনিয়ম হয়ে থাকে এই নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলিকে কেন্দ্র করে। অনেক বন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মতে, বন বিভাগের সকল দুর্নীতির মূলে রয়েছে এই বদলি বাণিজ্য। কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বিপুল অংকের ঘুষ দিয়ে তার কাঙ্ক্ষিত স্থানে বদলি হওয়ার পর সে ঐ পরিমাণের চেয়ে আরও বেশি টাকা অবৈধ উপায়ে সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ঘুষের টাকাকে অবৈধভাবে, দ্রুত ও সহজে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য বিনিয়োগ হিসেবে মনে করে। বদলি সংক্রান্ত অনিয়মসমূহের মধ্যে অর্থের বিনিময়ে লোভনীয় স্থানে বদলি, অর্থের বিনিময়ে নিয়মিত বদলি আদেশ স্থগিত বা প্রত্যাহার, এক লোভনীয় স্থান হতে বদলি হয়ে অন্য লোভনীয় স্থানে পোস্টিং, দুর্গম স্থানে বদলির ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায়, সাধারণ বদলির সুপারিশের জন্য চাঁদা আদায় অন্যতম।

এছাড়া বনবিভাগে নিয়োগকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন থেকে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮৪ সাল হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ষোল বছর বন বিভাগের ক্যাডার পদে নিয়োগ বন্ধ থাকায় বনবিভাগে যোগ্য কর্মকর্তার সংকট রয়েছে। বন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গুরুত্ব না দেওয়ায়, রেঞ্জারদের দায়েরকৃত এ সংক্রান্ত এক মামলা দীর্ঘদিন যাবৎ অনিষ্পত্তিকৃত অবস্থায় ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মকর্তা পর্যায়ে নিয়োগ বন্ধ থাকার কারণে বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মকর্তাদেরকে চলতি দায়িত্ব এবং একই সাথে একাধিক দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।

বন বিভাগের যে কোনো পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রেও অনিয়ম একটা সাধারণ ঘটনা। গত ২০-২৫ বছর ধরে সিসিএফ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবেই পদটিকে নিলামে তোলা হয়েছে। প্রথম তিনজনের প্যানেলের বাইরে থেকে জ্যেষ্ঠতার বিচারে পঞ্চম জনকেও এই পদে পদায়নের নজির আছে। সর্বশেষ পদচ্যুত সিসিএফকে এই পদের জন্য এক কোটি দশ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছিল। বন বিভাগের সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ ও পদায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি সমগ্র বনবিভাগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নির্দিষ্ট অংকের টাকা বিনিয়োগ করার মাধ্যমে সিসিএফ পদে নিয়োগ পাওয়ায়, পরবর্তীতে বন বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির সুপারিশের জন্যও অবৈধ আর্থিক সুবিধা বা চাঁদা দাবি করেন।

এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্প থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রেও অনিয়ম ও ঘুষ বাণিজ্য হয়ে থাকে। ফরেস্ট্রি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (এফআরএমপি) থেকে ৬৪ জন এসিএফকে ২০০০ সালে রাজস্ব বিভাগে স্থানান্তর করা হলেও, দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের ক্যাডারভুক্ত করার বিষয়টির সন্তোষজনক সমাধান ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রকল্প সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি

বনবিভাগে অনিয়ম ও দুর্নীতির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন। সাধারণত প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বেই বা অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে মোট বাজেটের একটা নির্ধারিত অংশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ঘুষ হিসেবে দিতে হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি স্তরে আর্থিক অনিয়ম হয়ে থাকে। চারা উন্নয়ন, বৃক্ষ রোপণ ও বনায়ন সংক্রান্ত প্রকল্পে সংঘটিত আর্থিক অনিয়মসমূহের মধ্যে জৈবসার বা গোবর এবং মাটি ক্রয়ে অনিয়ম, চারার অতিমূল্যায়ন, পরিবহণ ও সংরক্ষণে অনিয়ম অন্যতম। বন বিভাগের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অবকাঠামো নির্মাণ, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জাম ও যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ঠিকাদার নিয়োগে, দরপত্র আহবানে এবং নির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম হয়ে থাকে।

বিভিন্ন প্রকল্পে কনসালটেন্ট ফার্ম ও কনসালটেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রেও দরপত্র আহবান ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অবৈধ আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকে। প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কনসালটেন্ট কর্তৃক প্রদেয় কারিগরি প্রতিবেদন গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আর্থিক দুর্নীতির মাধ্যমে নিম্নমানের প্রতিবেদন গ্রহণ করা হয়। আবার আর্থিক সুবিধা ব্যতীত যথার্থ প্রতিবেদনও গ্রহণ করা হয় না। প্রকল্প মূল্যায়ন ও অডিট দলের প্রতিবেদন প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি ও সুষ্ঠ বাস্তবায়ন হচ্ছে এ মর্মে এবং সুষ্ঠ আর্থিক ব্যবস্থাপনার পক্ষে প্রতিবেদন তৈরিতে ঘুষ দিতে হয়, অন্যথায় নেতিবাচক প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ ও আর্থিক বরাদ্দ স্থগিত এমনকি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবৈধ আর্থিক লেনদেন ছাড়াও প্রকল্প পরিদর্শনের সময় পরিদর্শকদের জন্য মাত্রাতিরিক্ত আপ্যায়ন ও উপহার সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হয়।

সামাজিক বনায়নে অংশীদার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অবৈধ আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ বা তার প্রতিনিধি এবং কখনও কখনও বহিরাগতরা অংশীদার হিসেবে নির্বাচিত হয়। এমনকি প্রভাবশালী রাজনৈতিক মহলের চাপে প্রকল্পের শেষ দিকেও অংশীদারের তালিকা পরিবর্তন করার উদাহরণ আছে। এছাড়া দরিদ্র

অংশীদারদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্যও প্রত্যেকের কাছ হতে সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনভূমি জবর দখল

বন বিভাগের অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার অন্যতম নজির হচ্ছে সরকারি বনভূমি সংরক্ষণে ব্যর্থতা। বর্তমানে সারা দেশে বন বিভাগের বেদখল হয়ে যাওয়া বনভূমির মোট পরিমাণ ২৭০,৫৭০.৯৮ একর।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমি দখলের কারণ ও প্রক্রিয়ায় কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও সকল স্থানেই বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংশ্লিষ্টতা অন্যতম প্রধান অনুঘটক।

মধুপুর অঞ্চলের বনভূমির গঠন অন্যান্য বনাঞ্চল অপেক্ষা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। অপেক্ষাকৃত উঁচু বনভূমির মাঝেই রয়েছে নিচু সমতল কৃষি ভূমি যা ব্যক্তি মালিকানাধীন। স্থানীয় বন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতায় ব্যক্তি মালিকানাধীন এই সকল কৃষি ভূমির মালিকরা তাদের ভূমি সংলগ্ন বনভূমি অল্প অল্প করে আবাদের মাধ্যমে নিজস্ব ভূমির পরিমাণ বাড়িয়ে নেয়। অন্যদিকে স্থানীয় বন কর্মকর্তা যথাসময়ে ভূমি দখলে বাধা না দিয়ে বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পরোক্ষভাবে ভূমি দখলে সহায়তা করে। পরবর্তীতে আদালতে মামলা চলাকালীন যথাযথ প্রমাণ বা কাগজপত্র উপস্থাপন না করার মাধ্যমে আসামিপক্ষকে সহায়তা করে থাকে।

অন্যদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বনভূমি দখলের অন্যতম প্রধান কারণ স্থানীয় আদিবাসীদের ভূমি অধিকার সংক্রান্ত বিবাদের সুষ্ঠু নিষ্পত্তি না হওয়া। আদিবাসীরা দীর্ঘ দিন ধরে এই এলাকায় বসবাস করে আসায় সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় তাদের ভূমি অধিকার আছে বলে দাবি করে থাকে। ঐতিহ্যগতভাবেই স্থানীয় আদিবাসীরা জুম চাষের সাথে জড়িত। জুম চাষীরা নিয়মিতভাবে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জুম চাষ করে আসছে। জুম চাষের নেতিবাচক প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে বনভূমি উজাড় হয় এবং সেই বিরান বনভূমিতেই দরিদ্র আদিবাসীরা বসতি গড়ে তুলে। ২০০৬ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট সংরক্ষিত বনভূমির প্রায় ৪৩.৫৪% ভূমি বেদখল হয়ে গেছে বলে উল্লেখ করা হয়।

সুন্দরবন সংলগ্ন বন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় কমপক্ষে ২শ' বর্গ কি.মি. বনভূমি বেদখল হয়ে গেছে। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, সুন্দরবন পূর্ব বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের স্টেশন অফিসের সামনে থেকে ভোলা নদীর উত্তর পাড় বেদখল হয়ে গেছে। ভোলা নদী আর খরসা খাল মরে যাওয়ার কারণে সুন্দরবনের মধ্যেই বাড়িঘর নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করা হয়েছে। এরই মধ্যে ওই এলাকার জিউধারা থেকে জয়মনি পর্যন্ত ধানসাগর, বৈদ্যবাড়ি, সুন্দরবন, হোকলাবোনিয়া, কচুবোনিয়া- প্রায় ২০০ বর্গ কি.মি. সুন্দরবন এলাকা স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ভূমি দস্যুরা দখল করে নিয়েছে।

বন নীতি ও বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন

সরকার ও বন বিভাগ অনেকক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত বন আইন, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ আইন এবং বন নীতি উপেক্ষা করে বিদেশী তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানিগুলোকে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনার অনুমতি দিয়ে থাকে। ২০০৪ সালে লাউয়াছড়ার সংরক্ষিত বনে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব উপেক্ষা করে বনের ভিতর দিয়ে গ্যাস পাইপলাইন নেওয়া হয়। গ্যাস পাইপলাইনে কোনো ধরনের দূর্ঘটনা ঘটলে সমগ্র লাউয়াছড়া বনাঞ্চলের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। পুনরায় ২০০৮ সালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় লাউয়াছড়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করে গ্যাস অনুসন্ধানে ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরিপ পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে।

তথ্য প্রদানে অনীহা ও অসহযোগিতা

বন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যালয়ে বন বিভাগ সংশ্লিষ্ট কোনো ধরনের তথ্য পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাংবাদিক, বন ও বন বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণায় নিয়োজিত গবেষক ও ছাত্র, লেখক এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য বন বিভাগ থেকে কোনো ধরনের সহায়তা পান না। এক্ষেত্রে যে কোনো তথ্যের জন্যই ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করে বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তাদের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। যে কোনো তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি সংগ্রহের প্রয়োজন হয়।

অনেকের জন্যই দূরত্ব এবং অন্যান্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি সংগ্রহ প্রকারান্তরে এক অসম্ভব ব্যাপার। বন বিভাগের ওয়েবসাইটেও সব ধরনের তথ্য প্রদান করা হয় না এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না। ওয়েবসাইটে বন বিভাগের বনজ সম্পদের উৎপাদনের পরিমাণ ও রাজস্ব আয় সংক্রান্ত সর্বশেষ ২০০৩ সাল পর্যন্ত তথ্য দেওয়া রয়েছে।

বাংলাদেশের বনাঞ্চল ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, বনজ সম্পদের টেকসই উন্নয়ন এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব বন বিভাগের হাতে ন্যস্ত। অথচ বন বিভাগের কিছু দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীর অসাধুতা ও সামগ্রিকভাবে বন বিভাগের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে বাংলাদেশের বন ও বন-নির্ভর জীববৈচিত্র্য আজ বিলীন হওয়ার পথে। মূলত দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা ও সদিচ্ছার অভাবই বনবিভাগে বিদ্যমান অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির জন্য দায়ী।

তবে বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নে কার্যকর ও যুগোপযোগী বন নীতির অভাব, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাও এক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে।

সুপারিশমালা

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের আলোকে বিদ্যমান দুর্নীতি ও সংকট দূর করে বন বিভাগকে একটি গতিশীল, কার্যকর, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের জন্য

০১. বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন যে সকল এলাকায় ভূমি দখল হয়ে গেছে এবং দখলের প্রবণতা রয়েছে, সেসকল এলাকায় বনের ভূমি উদ্ধার করে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে 'কম্যুনিটি ফরেস্ট্রি' গড়ে তুলতে হবে।

০২. সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বিদেশি ও দামি কাঠের বৃক্ষ রোপন বন্ধ করে দেশজ, ফলজ ও ঔষধি প্রজাতির বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

০৩. কাঠের চাহিদা পূরণে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরের অংশে, রক্ষিত বনাঞ্চলে এবং অশ্রেণীভুক্ত বনভূমিতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে বাফার জোন, উডলট ফরেস্ট্রি, এগ্রোফরেস্ট্রি মডেলে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

০৪. সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার জনসাধারণকে বনজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যাপক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

০৫. বিকল্প জীবিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন উপজেলা ও জেলা শহরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। সেই সাথে বিভাগীয় শহরে ইপিজেড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানো যেতে পারে।

০৬. বর্তমানে দেশে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে বর্ষাকালে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি চালু করতে হবে। প্রয়োজনে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বন বিভাগ এক্ষেত্রে দেশের গণমাধ্যমকে ব্যবহার করতে পারে।

০৭. কাঠের জন্য দেশের বনের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে বিদেশ হতে কাঠ আমদানিতে উৎসাহ ও সহায়তা দিতে হবে।

০৮. রাজস্বমূখী বন নীতির পরিবর্তে সংরক্ষণমূলক বন নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বাস্তবভিত্তিক ও পরিবেশবান্ধব রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

০৯. রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছা ব্যতীত দেশের অন্যান্য সরকারি কার্যালয়ের মতোই বন বিভাগের দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ঐকমত্য প্রয়োজন।

সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাস

১০. অন্যান্য সরকারি বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের সাথে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন বিভাগীয় সিদ্ধান্তের কার্যকর বাস্তবায়নে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য বন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোতে 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অব ফরেস্ট' পদটি পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১১. ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট, প্লানিং, এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং শাখা, বন সম্প্রসারণ ও সামাজিক বনায়ন শাখা এবং বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ শাখার জন্য তিনজন পৃথক সিসিএফের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

১২. আইজি অব ফরেস্ট ও সিসিএফ পদসমূহে শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠতার বিচারে পদায়ন বা পদোন্নতি না দিয়ে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্যানেল থেকে সততা, সুনাম ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে হবে।

১৩. বন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোকে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের দুর্গম স্থানসমূহের ক্যাম্প ও স্টেশনে প্রয়োজনানুযায়ী জনবল বৃদ্ধি করতে হবে।

১৪. বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের 'চলতি দায়িত্ব' না দিয়ে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। বিশেষ করে সিসিএফ পদে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্বে পদোন্নতি দিতে হবে। প্রয়োজনে পদোন্নতির বিদ্যমান নীতি পরিবর্তন করতে হবে।

১৫. বন বিভাগের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মন্ত্রণালয় ও সচিবের বিশেষ ভূমিকা থাকে। সুতরাং সকল সিদ্ধান্তের দায়ভারও মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সচিবকে গ্রহণ করতে হবে।

১৬. একই বন বিভাগে দুই বছর এবং একই সার্কেলে তিন বছরের বেশি কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত থাকতে পারবেন না। বদলি হওয়ার ছয় বছরের মধ্যে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পূর্বের কর্মস্থলে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া যাবে না।

১৭. নির্দিষ্ট সময় পর পর বন বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যক্তিগত ও পরিবারের সদস্যদের সম্পত্তির হিসাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। প্রয়োজনে দুদক ও এনবিআর কর্তৃক এই প্রতিবেদন যাচাই করতে হবে।

১৮. বন বিভাগের অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, প্রয়োজনে দ্রুত ট্রাইবুনালের আওতায় তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯. গুরুত্বপূর্ণ বন বিভাগ সংলগ্ন সকল জেলায় বন আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২০. গুরুত্বপূর্ণ বন বিভাগসমূহে বন অপরাধ এবং বনজ দ্রব্য চুরি ও পাচার রোধে বন বিভাগ, পুলিশ, সেনাবাহিনী ও বিডিআর এর সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট সিএফের অধীনে 'জয়েন্ট টাস্কফোর্স' গঠন করতে হবে।
২১. বন আইন অমান্য করে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ১০ কি.মি. এর ভিতরের সকল স'মিল, উড প্রসেসিং মিল এবং ৩ কি.মি. এর ভিতরের সকল ফার্নিচারের দোকান উচ্ছেদ করতে হবে।
২২. সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার সকল অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার কৌশলগত অবস্থানে জয়েন্ট টাস্কফোর্সের ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে ইটভাটায় কাঠের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
২৩. বন বিভাগের নিলামে অংশগ্রহণের জন্য সকল কাঠ ব্যবসায়ীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। বন অপরাধের কারণে দন্ডিত এবং বন বিভাগের 'অফেন্স রিপোর্ট রেজিস্টারে' তালিকাভুক্ত কোনো ব্যবসায়ী পরবর্তীতে বন বিভাগের কোনো নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না- এ ধরনের নীতি গ্রহণ করতে হবে।
২৪. বন বিভাগের যে কোনো তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে

২৫. বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বাড়াতে হবে।
২৬. মাঠ পর্যায়ে কার্যকর বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় যানবাহন, জ্বালানি তেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অফিস উপকরণ বরাদ্দ করতে হবে।
২৭. আটক বনজ দ্রব্য ও আসামি পরিবহণ, কোর্টে বা থানায় মামলা দায়ের, রিট আবেদনের ক্ষেত্রে আইনজীবী নিয়োগ, বিভিন্ন মামলার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণ ভাতা প্রভৃতি খরচ মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।
২৮. সততা, যোগ্যতা ও বিশেষ কর্মদক্ষতার জন্য নিয়মিত পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।
২৯. অবৈধ বনজ দ্রব্য আটকের ক্ষেত্রে উৎসাহ ভাতা বা আটক বনজ দ্রব্যের নির্দিষ্ট অংশ পুরস্কার হিসেবে দিতে হবে।
৩০. নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে দুর্গম স্থানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঝুঁকি ভাতা দিতে হবে।
৩১. বন বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দুর্গম স্থানের স্টেশন, চেকপোস্ট ও ক্যাম্পে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবার সাথে রাখার সুযোগ না থাকায় অতিরিক্ত খরচ করতে হয়। এক্ষেত্রে তাদেরকে বিশেষ ভাতা দিতে হবে।
৩২. অবৈধ বনজ দ্রব্যের পাচার রোধে গোপন সংবাদদাতার জন্য সোর্সমানির ব্যবস্থা করতে হবে।
৩৩. বনরক্ষী হতে রেঞ্জার পর্যন্ত সকলের অফিসিয়াল ইউনিফরম ব্যবহারের নিয়ম কার্যকর করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।
৩৪. বনের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বনরক্ষীদের অকেজো অস্ত্রের পরিবর্তে আধুনিক অস্ত্র এবং এগুলো ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩৫. বিদেশে বন ও পরিবেশ সংক্রান্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, শিক্ষা সফর ও স্বল্পমেয়াদি কোর্সে বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে মন্ত্রণালয় এবং সচিবালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপ্রয়োজনীয় প্রমোদ ভ্রমণ বন্ধ করতে হবে।

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

বন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। একটি দেশের তেল সম্পদ বা খনিজ সম্পদ কোনো না কোনো সময় শেষ হয়ে যেতে পারে কিন্তু বনজ সম্পদ শেষ হয় না যদি এর সুরক্ষা ও পরিচর্যার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা থাকে। তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ আহরণে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, বন সম্পদ সংরক্ষণে ও সৃজনে তুলনামূলকভাবে ব্যয় হয় অনেক কম। কাজেই বনকে বলা হয় নবায়নযোগ্য বা পুনরুৎপাদনশীল সম্পদের অফুরন্ত উৎস। বন ও বৃক্ষ মানুষকে কেবল বস্তুগত সম্পদ সরবরাহ করেই মানবজাতির উপকার করে না, বন ও বনাঞ্চল মানুষকে সুস্থ পরিবেশে বাসযোগ্য একটি সুন্দর পৃথিবীও উপহার দেয়।[১] বন ও বনাঞ্চল থেকে মানুষ জ্বালানি কাঠ, গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্রের জন্য কাঠ, বাঁশ, বেত, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য, শিল্পের কাঁচামাল, ভেষজ উপাদান ইত্যাদি পেয়ে থাকে। এগুলো হলো বন থেকে প্রাপ্য বস্তুগত সম্পদ।

বস্তুগত সম্পদ ছাড়াও পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে রাখায় বন ও বনাঞ্চলের ভূমিকাই প্রধান। পরিবেশের সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সুস্থতা বজায় রাখায় বনাঞ্চল মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। বায়ুমন্ডলের আর্দ্রতা বৃদ্ধি ও তাপের সমতা রক্ষা, বন্যা ও প্লাবন রোধ, ভূমির ক্ষয়রোধ, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস রোধ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণের (Absorbation) মাধ্যমে বায়ু বিশুদ্ধকরণ, বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন সরবরাহ, মরুবিস্তার রোধ, পশুপাখির আশ্রয়স্থল সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অর্থাৎ জাতীয় অর্থনীতি এবং পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন ও ভারসাম্য রক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই এর গুরুত্ব ও প্রয়োজন অপরিসীম। ২০০৬-০৭ সালে বাংলাদেশের জিডিপি'র ১.৫২ শতাংশ আসে বন থেকে।[২]

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। বাংলাদেশের মোট আয়তন ১৪৭.৫৭ হাজার বর্গ কি.মি. এবং ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৩.০৫ কোটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৫৯ শতাংশ।[৩] বাংলদেশের দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যা এদেশের সকল সম্পদের জন্যই হুমকিস্বরূপ। ১৯৪০ সালে এই দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪ কোটি, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩ কোটির উপরে। ধারণা করা হয় তা ২০২৫ সালে প্রায় ১৭ কোটি ৭৩ লাখ এবং ২০৫০ এর মধ্যে ২১ কোটি ৮ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে।[৪]

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য যেখানে দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি প্রয়োজন সেখানে আমাদের দেশে রয়েছে অনেক কম। উনিশ শতকের শেষে বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ মোট ভূমির ২৫ শতাংশের বেশি ছিল। এই পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল। কিন্তু আজ বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট ভূমির ১০ শতাংশের নিচে বনাঞ্চল রয়েছে বলে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।[৫] অন্যদিকে বন বিভাগ প্রদত্ত তথ্যানুসারে, বাংলাদেশে মোট ২.৫২ মিলিয়ন হেক্টর বনভূমি রয়েছে, যা দেশের মোট ভূমির প্রায় শতকরা ১৭.৪ শতাংশ। বন বিভাগ বর্তমানে দেশের ১০.৩০ শতাংশ বা ১.৫২ মিলিয়ন হেক্টর ভূমি নিয়ন্ত্রণ করছে। এর মধ্যে রয়েছে পাহাড়ি বন, সমতল ভূমির বন, সুন্দরবন, উপকূলে তৈরি করা বন এবং চা ও রাবার বাগানে সৃষ্ট বন।[৬] অবশিষ্ট ০.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর জুড়ে রয়েছে জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল এবং ০.২৭ মিলিয়ন হেক্টর গ্রামীণ বন।

দেশে মোট বনভূমির পরিমাণগত পরিসংখ্যান নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এফএও'র এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ মোট ভূমির ১৮-১৯% উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে বন রয়েছে মোট ভূমির ১০-১২% ভূমিতে এবং বৃক্ষ আচ্ছাদন রয়েছে মাত্র ৫-৭% ভূমিতে। আরও উল্লেখ করা হয়, দেশের মোট প্রাকৃতিক বনাঞ্চল রয়েছে ৭৬৯,০০০ হেক্টর যা মোট ভূমির ৫.৯% এবং সৃজিত বন বা বাগান রয়েছে ৩৩৫,০০০ হেক্টর যা মোট ভূমির ২.৫%।[৭]

দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক এক জরিপে এ ব্যাপারে সবচেয়ে আশংকাজনক তথ্য পাওয়া যায়। ২০০৫-২০০৭ সালে এফএও এর সহযোগিতায় বন বিভাগ ও স্পার্সোর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই জরিপ অনুযায়ী দেশে মোট বনভূমির

---

[১] তপন চক্রবর্তী, *বাংলাদেশের বন ও বনাঞ্চল*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃঃ ৫৪।

[২] BBS, 2007. http://www.bbs.gov.bd/dataindex/gdp_2006_07.pdf Accessed on 4 May, 2008.

[৩] BBS, 2007. http://www.bbs.gov.bd/dataindex/census/bang_atg.pdf Accessed on 4 May, 2008.

[৪] J.Davidson, *Social Forestry in Bangladesh and Social Forestry Reasearch at the Bangladesh Forest Research Institute.* Consultancy Report. Chittagong: ARMP, BFRI, 2000, 145pp. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

[৫] ফিলিপ গাইন, *বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম*, ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, ২০০৪, পৃঃ ৩১।

[৬] প্রাগুক্ত, পৃঃ ১।

[৭] FAO. 1993. Forest Resources Assessment 1990: Tropical Countries. FAO Forestry Paper 112, Rome. 44p. (Cited in Haque, N. Depletion of Tropical Forests with Particular Reference to Bangladesh.) htttp://www.eb2000.org/short_note_10.htm Accessed on 24 April 2008.

পরিমাণ ১.৪৪২ মিলিয়ন হেক্টর যা দেশের মোট ভূমির ৯.৮%। এর মধ্যে বন বিভাগের প্লান্টেশন বা সৃজিত বন, রাবার বাগান এবং বাঁশ বা মিশ্র ঘাস জাতীয় বন অন্তর্ভুক্ত।[৮]

প্রতিনিয়ত বন উজাড় হওয়ার কারণে বনজ সম্পদকে এদেশের সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন ও ক্ষতিগ্রস্ত একটি খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অতীতের বনাঞ্চলের একটি বিরাট অংশে বর্তমানে অবশিষ্ট আছে শুধুমাত্র ঘাস ও ঝোপঝাড়। ১৯৮০ সালের দিকে এদেশে প্রতি বছর ৮,০০০ হেক্টর জমির বন উজাড় হতো, যা এফএও (FAO) এর একটি সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী প্রতি বছর ৩৭,৭০০ হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে। একটি বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকের সূত্র মতে, বর্তমানে বন উজাড়ের হার ৩.৩।[৯] তবে দেশে পরবর্তী দশকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদী এবং মন্ড বা কাগজ তৈরির জন্য বনায়নের উপর যে চাপ পড়েছে তাতে ধারণা করা যায় এ সময় বনবিনাশ ঘটেছে আরও দ্রুত গতিতে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে গড়পড়তা শতকরা ০.৬ শতাংশ বন বিনাশের হিসাব বিবেচনায় বাংলাদেশে যে হারে বনবিনাশ হয়েছে তা আশংকাজনক।[১০] ইউএসএইড ও সিডা এর একটি জরিপে বলা হয়েছে, গত ২০ বছরে এদেশের ৫০% বন ধ্বংস করা হয়েছে।[১১] তেমনিভাবে মাথাপিছু বনভূমির আয়তন ১৯৬৯ সালের ০.০৩৫ হেক্টর থেকে ১৯৯০ এ এসে কমে ০.০২ হেক্টরে দাঁড়ায়। বন ধ্বংসের কারণে ভূমির পানি ধারণ ক্ষমতা ও পানি ধারণ এলাকা কমে যায়, ভূমির ক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রাণী ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পড়ে যার পরিমাণ ১৯৯০ এ ছিল জিডিপির ১ শতাংশ।[১২] বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের এক হিসাব অনুযায়ী দেশের সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চল থেকে দেশের মোট জ্বালানি ও কাঠের চাহিদার মাত্র ১৫ শতাংশ পূরণ করা সম্ভব হয়।[১৩]

বাংলাদেশে বিদ্যমান বনাঞ্চলের ভারসাম্যহীন স্থানিক বিন্যাসের কারণেও এই বন পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মোট বনাঞ্চলের প্রায় ৪৪% দেশের পূর্বাঞ্চলে আন্তর্জাতিক সীমানায় পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত। আরও ৩৯% জুড়ে আছে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ম্যানগ্রোভ বনভূমি বা সুন্দরবন। দেশের বাদবাকি বিস্তৃত সমভূমিতে যেখানে প্রায় সকল জনসংখ্যার বসবাস, সেখানে মোট বনভূমির মাত্র ৮% শালবন বিদ্যমান। দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ২৮টি জেলায় কোনো প্রাকৃতিক বনভূমি অবশিষ্ট নেই।[১৪] বর্তমানে এই সব প্রাকৃতিক বনভূমির পুনরুৎপাদন ক্ষমতাও অত্যন্ত কম। বিগত ২৫ বছরে ম্যানগ্রোভ ও পাহাড়ী বনের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা ২৫% হ্রাস পেয়েছে।[১৫]

মধুপুর ও অন্যান্য জায়গায় ঐতিহ্যবাহী শালবন আজ প্রায় ইতিহাস। ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলায় ১২০,০০০ হেক্টর জুড়ে বিস্তৃত ছিল ঝরাপাতার শালবন। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে সমগ্র শালবনের ১০

---

[৮] BFD, Ministry of Environment and Forest, FAO and Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization, Ministry of Defence. *National Forest and Tree Resources Assessment 2005-2007, Bangladesh.* Dhaka, 2007.

[৯] N.A.Khan, *RETA 5900, Bangladesh Country Case Study* (Final Report). Manila, Philippines: AWFN, ADB. 2001 (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

[১০] ফিলিপ গাইন, 'বিপন্ন বন', ফিলিপ গাইন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের বিপন্ন বন*, ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ২০০৫, পৃষ্ঠা: ১৯।

[১১] N.Huda and M.K.Roy, 'State of the Forests', Q.I. Chowdhury (edited), *Bangladesh State of Environment Report 1999*, p175-190. Dhaka: Forum of Environmental Journalists of Bangladesh, 1999 (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

[১২] BBS. 1999. Statistical Year Book of Bangladesh. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, GoB, Dhaka. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

[১৩] Forest Resources Management Project (FRMP).1992. *Forest Resources MAnagement Project.* Ministry of Environment and Forest, GoB, Dhaka. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload /371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

[১৪] Forestry Master Plan (FMP). 1994. *Forestry Master Plan.* Ministry of Environment and Forest, GoB, UNDP/FAO. BGD/88/025, Dhaka. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload /371/attach /08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

[১৫] Overseas Development Administration (ODA). 1985. *Forest Inventories of Sunderbans: Main Report*. Ministry of Environment and Forest, GoB, Dhaka. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp /modules/ envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

শতাংশ অবশিষ্ট আছে। ফরেস্ট্রি মাস্টার প্লানের (১৯৯৩ সনে সম্পন্ন) তথ্য অনুসারে কেবল টাঙ্গাইল জেলাতে ১৯৭০ সালের ২০,০০০ হেক্টরের শালবন ১৯৯০ সালে ১,০০০ হেক্টর অবশিষ্ট আছে।[১৬] মধুপুর বনের টাঙ্গাইল অংশের ৪৬ হাজার একরের মধ্যে রাবার বাগান হয়েছে ৭৮০০ একর, টেলকি নামক স্থানে বিমান বাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জ তৈরি করা হয়েছে ১০০০ একর জুড়ে এবং জবর দখল হয়েছে ২৫ হাজার একর। বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে আছে মাত্র ৯ হাজার একর।[১৭]

পার্বত্য চট্টগ্রামে বন বিনাশের অন্যতম কারণ এ অঞ্চলে সামরিক কর্মকান্ড। সামরিক ক্যাম্প তৈরি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যাপক বৃক্ষ নিধন হয়েছে। এছাড়া বাঙালি অভিবাসন ও বৃক্ষচোরদের কারণে কাসালং ও মাতামুহুরীর সংরক্ষিত বনে ব্যাপক বৃক্ষ নিধন হয়েছে। বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) এর বৃক্ষ সম্পদ আহরণ পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করেছে। উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের কাসালং সংরক্ষিত বনের কেন্দ্রে ও দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রামের সাংগু সংরক্ষিত বনে বিএফআইডিসির স'মিল ও বৃক্ষকর্তন কর্মসূচি রয়েছে। মূলত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, সামরিকীকরণ, বাঙালি অভিবাসন, লগিং, বাণিজ্যিক বা শিল্প বন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস ও তেল অন্বেষণ পাবর্ত্য চট্টগ্রামের বন বিনাশের জন্য দায়ী।[১৮]

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের ভেতরে ও আশপাশে যেভাবে অত্যাচার চলছে তা দ্রুত বন্ধ করা না গেলে ফলাফল হবে ভয়াবহ। সুন্দরবন স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিবেচনাহীন সম্পদ আহরণে এর মৎস্য সম্পদ ক্রমান্বয়ে কমে আসছে, বৃক্ষসম্পদ লুটপাট হচ্ছে, পৃথিবীর সর্বশেষ রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ বন্যপ্রাণী বিপন্ন হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে চিংড়ির পোনা সংগ্রহ সুন্দরবন ও এলাকায় একটি বড় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। সুন্দরবন ও উপকূলীয় প্রাণ-বৈচিত্র্যের উপর নির্বিচারে চিংড়ির পোনা ধরার বিরূপ প্রভাবের কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালের ২১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় জলসীমা ও মোহনায় প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা, মৎস্য পোনা ও অন্যান্য প্রজাতির যেকোনো বয়সের মৎস্য পোনা আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[১৯] কিন্তু বাস্তবে এই আইনের কোনো প্রয়োগ নেই। চিংড়ি ধরার মৌসুমে হাজার হাজার নর-নারী দিনরাত চিংড়ি পোনা ধরছে। চিংড়ির পোনা ধরার পাশাপাশি তারা তাদের রান্নাবান্না ও অন্যান্য প্রয়োজনে সুন্দরবনের বৃক্ষ সম্পদ ব্যবহার করেন। অনেক সময় অনেকে অবৈধ কাঠ পাচারে জড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন আকারের ঠেলা জাল, পাতাজাল ও টানা জাল দিয়ে চিংড়ির পোনা ধরার সময় প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য মাছের পোনা আটকা পড়ে এবং মারা যায়। এর ফলে পুরো সুন্দরবন জুড়ে মৎস্য সম্পদ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।[২০] ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট এসিস্ট্যান্স এর এক জরিপ অনুসারে (১৯৮৩-৮৪) সুন্দরবনের দুটি প্রধান বাণিজ্যিক প্রজাতির বৃক্ষ ১৯৫৭ এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।[২১]

বিশাল এক জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। এসকাপের (ESCAP) এক জরিপ অনুসারে পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ মানুষ সরাসরি তাদের জীবিকার জন্য বনের উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে বনজ সম্পদনির্ভর বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। সুন্দরবন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লাভের গুরুত্বপূর্ণ উৎসই নয়, উপকূলীয় ভূমিক্ষয় এবং ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে উপকূলীয় মানুষ ও তার সম্পদকে রক্ষার প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[২২]

চকোরিয়া সুন্দরবন এখন নামেই বনভূমি। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে কক্সবাজার জেলায় দু'দশক আগেও যে ২১,০০০ একরের সুন্দরবন বা ম্যানগ্রোভ বনভূমি ছিল, তা এখন নিস্তরঙ্গ লোনা পানির চিংড়ির ঘের। ১৯২৯ সনে বৃটিশ সরকার চকোরিয়া সুন্দরবনেরই একাংশ বদরখালিতে জনবসতি গড়ে তোলার জন্য সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতি গঠন করে ২৬২টি ভূমিহীন পরিবারকে ৩৯১০ একর জমি ইজারা দেয়। এই এলাকায় বন উজাড়ের প্রক্রিয়া তখন থেকেই শুরু হয়। তবে সত্তর দশকের শেষ দিকে এবং আশির দশকে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের চিংড়ি চাষ প্রকল্প শুরু হওয়ার পরই মূলত বন ধ্বংসের হিড়িক পড়ে। ১৯৮৫ সনে সরকার চিংড়ি চাষের উপযোগী চকোরিয়া সুন্দরবনের সকল জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করে। এভাবেই এক সময়ের সংরক্ষিত ও রক্ষিত চকোরিয়া সুন্দরবন বিলীন হয়ে পরিণত হয়েছে চিংড়ি খামারে। উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ছবি অনুসারে ১৯৭২ সালেও চকোরিয়া সুন্দরবনের ১৯,৩৯০ একর জমি বনে আচ্ছাদিত ছিল। ১৯৭৬ সালেও বন প্রায় অক্ষত ছিল। এরপর ১৯৭৯ সনে বনের উত্তর-পশ্চিমাংশের খানিকটা উধাও। ১৯৮১ সনে এসে বনের পরিমাণ মাত্র ৮,৬৫০ একর। ১৯৮৫ সনে ৪০৭২ একর এবং ১৯৯১ সনে ১৯৪৫ একর। অবশেষে ১৯৯৫ সালে চকোরিয়া সুন্দরবন একেবারেই বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়ে।[২৩]

---

[১৬] ফিলিপ গাইন, ২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ২৭।

[১৭] ফিলিপ গাইন, 'দেশীয় প্রজাতির নির্বিচর বিনাশ: মধুপুর শালবন বিলীন হবার পথে', ফিলিপ গাইন (সম্পাদিত), *বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম*, ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ২০০৪, পৃষ্ঠা: ১৩৫।

[১৮] ফিলিপ গাইন, ২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৪৭।

[১৯] বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, এসআরও নং ২৮৯/আইন/২০০০।

[২০] ফিলিপ গাইন, ২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৫।

[২১] ফিলিপ গাইন, ২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৭।

[২২] ফিলিপ গাইন, ২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৬।

[২৩] ফিলিপ গাইন, ২০০৪, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১৭০।

পরিবেশ রক্ষা আর ব্যবসার মধ্যে বিদ্যমান সার্বক্ষণিক বিরোধকে বিবেচনা করেই এ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা উচিত। এক হিসেবে দেখা যায়, প্যারাবন ও অন্যান্য জলজ সম্পদ এবং স্থানীয় জনগণের জীবন ব্যবস্থা ধ্বংসের বিনিময়ে মাত্র আট ডলার নিরানব্বই সেন্টে যে চিংড়ি রপ্তানি করা হয়, তার পেছনে বাংলাদেশের খরচ পড়ে কমপক্ষে ২৫০ থেকে ৩০০ ডলারের কাছাকাছি। তেমনিভাবে, প্রায় ৬ হাজার ২'শ কোটি টাকার ভেষজ লতাগুল্মের বিশ্ববাজার দখলের উদ্দেশ্যে সব লতাগুল্ম বিদেশে রপ্তানির চিন্তাও সুস্থ চিন্তা নয়। বাজার বা বাজারে মুনাফা ছাড়া গাছপালা-লতাগুল্মের আর কোনো মূল্য নেই এমন মানসিকতা এক ধরনের জাতীয় ব্যাধি।[২৪]

সরকারের বন ব্যবস্থাপনার অনেকগুলো উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হচ্ছে বর্তমান অনিয়িমিত, ক্ষয়িত এবং কম উৎপাদনশীল বনের জায়গায় দেশের মাটি ও প্রয়োজনের সাথে মানানসই মূল্যবান ও অধিক উৎপাদনশীল প্রজাতি দিয়ে মানুষের তৈরি প্লান্টেশন বা কৃত্রিম বন গড়ে তোলা। বন বিভাগ এ লক্ষ্য নিয়ে সরকারি বনভূমিতে বনায়নের যে চর্চা করছে তার ফল হয়েছে নেতিবাচক। স্থানীয় বনের জায়গায় তৈরি করা হয়েছে তথাকথিত 'কৃত্রিম বন' বা 'লাগানো বন'। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সুন্দরবনের বাইরে সরকারি বনভূমির এ জীর্ণদশা সর্বত্র।[২৫]

বাংলাদেশে বিদেশী বা আগ্রাসী প্রজাতি দিয়ে প্লান্টেশন বা বনায়ন ১৮৭২ সালে শুরু হলেও এর দ্রুত প্রসার ঘটেছে সাম্প্রতিক সময়ে। পৃথিবী জুড়েই প্লান্টেশন বনায়নের অধিকাংশ সম্পন্ন হয়েছে গত অর্ধশতাব্দী জুড়ে এবং প্লান্টেশন বনায়ন ক্রমাগতভাবে বাড়ছেই।[২৬] বাংলাদেশের যেসব এলাকায় বর্তমানে সামাজিক বনায়ন, উডলট বনায়ন, রাবার চাষ বা শিল্প বনায়ন অর্থাৎ কৃত্রিম বনায়ন হয়েছে তার বেশিরভাগ এলাকায় কিছু দিন পূর্বেও প্রকৃতিক বন ছিল। তবে অনেক জায়গায় এই ধরনের তৈরি করা বনও উজাড় হয়ে যাচ্ছে। বন বিশেষজ্ঞদের মতে এ ধরনের স্বল্পমেয়াদী কৃত্রিম বনায়ন প্রকৃত অর্থে বন নয়। কেননা প্রাকৃতিক বন তৈরি হয় হাজার বছরের পরম্পরায়, হাজার ধরনের জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে। কৃত্রিমভাবে নির্দিষ্ট কিছু প্রজাতির গাছ লাগানোর মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন সৃষ্টি সম্ভব হয় না। এ জাতীয় বন বাণিজ্যিক প্রয়োজনে চাষ করা ফসলের মতো। প্রাকৃতিক বনের মূল বৈশিষ্ট্য তথা স্বাভাবিক জীববৈচিত্র্য এ ধরনের বিদেশী প্রজাতি দিয়ে গড়া কৃত্রিম বনে অনুপস্থিত।[২৭]

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক বা শিল্পবন মূলত রাবার, সেগুন, জ্বালানি কাঠ উৎপাদন এবং মন্ড ও পেপারমিলের কাঁচামাল তৈরির কৃত্রিম বনের মধ্যে সীমিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, সিলেট ও শালবন এলাকায় প্রধানত কৃত্রিম বন তৈরি করেছে বন বিভাগ ও বিএফআইডিসি। জ্বালানি কাঠের বা শিল্পবনে যেসব প্রজাতি দিয়ে বনায়ন করা হয়েছে তার মধ্যে বিদেশী বা আগ্রাসী প্রজাতি যেমন ইউক্যালিপটাস, আকাশিয়া, পাইন অন্যতম। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে নিয়েছে এই বিদেশী প্রজাতির কৃত্রিম বন। কৃত্রিম বন যেখানেই তৈরি হচ্ছে সেখানে ও তার আশেপাশের প্রাকৃতিক বন দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে প্রকৃতিক বন ফিরিয়ে আনার কোনো সম্ভাবনা নেই সেখানে কৃত্রিম বন তৈরি করার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কৃত্রিম বন তৈরি করতে যেয়ে অনেক জায়গায় প্রকৃতিক বন বিনাশ করা হয়েছে। অথচ আমাদের প্রকৃতিক বনের পরিমাণ এতোই কম যে যা কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে তা রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।[২৮]

১৯৬৯ সালে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে রাবার চাষ শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে ৪০,০০০ একর ভূমিতে রাবার চাষের পরিকল্পনা থাকলেও ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ২৫,০০০ একর জমি রাবার চাষের আওতায় আনা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় রাবার উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৮৬ সালে মধুপুরে রাবার চাষ শুরু হয়। এখানে প্রায় ৮০০০ একর জমিতে রাবার চাষ হয়েছে। মধুপুরে যখন রাবার চাষ শুরু হয়, তখন শালকপিস রক্ষা করে মধুপুরে শালবন ফিরিয়ে আনা যেতো এমন অনেক জায়গাও কেটে পরিষ্কার করে রাবার চাষ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মধুপুরে রাবার চাষ করতে যেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় আদিবাসীদের সাথে বন বিভাগের বিরোধ ও সংঘাত বেড়েছে, তাদের ঐতিহ্যগত অধিকার ও স্বার্থ ক্ষুন্ন করা হয়েছে।[২৯]

বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক বা শিল্পবন মন্ড ও কাগজ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ফলদায়ক হলেও এবং জ্বালানি কাঠের চাহিদা কিছুটা পূরণ করলেও সার্বিক বিবেচনায় বিশেষ করে বিদেশী আগ্রাসী প্রজাতির বাণিজ্যিক বা শিল্পবন ফলদায়ক হয়নি। বরং তা প্রাকৃতিক বনের জন্য মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করেছে। একইসাথে ঋণের টাকায় বনায়ন করতে যেয়ে ঋণের বোঝা বেড়েছে। বিদেশী ঋণের টাকায় পরিচলিত প্রকল্প সৃষ্ট সমস্যার দুইটি বড় উদাহরণ হচ্ছে কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প ও চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলি পেপার মিল। কাগজের মিল তৈরির পর থেকে এ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ টন বাঁশ ও নরম কাঠ আহরণ করা হয়েছে কাগজ

---

[২৪] ফরহাদ মজহার, গাছপালা, 'লতা-গুল্মের ব্যবসা ও রাজনীতি', ফিলিপ গাইন (সম্পাদিত), *বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম,* ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ২০০৪, পৃষ্ঠা: ৩০।

[২৫] ফিলিপ গাইন, ২০০৪, প্রাগুক্ত, পৃ: vii।

[২৬] পিটার কানোস্কি, 'প্লান্টেশন ফরেস্ট্রী এট দি মিলেনিয়াম', ইয়েল ইউনিভার্সিটি, *ফরেস্ট ইন এ ফুল ওয়ার্ল্ড*, ২০০১। (উদ্ধৃত, গাইন, ফিলিপ। ২০০৫। 'বিপন্ন বন', ফিলিপ গাইন (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের বিপন্ন বন*। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা।)

[২৭] ফিলিপ গাইন, ২০০৪, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ২০।

[২৮] ফিলিপ গাইন, ২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৫৬।

[২৯] ফিলিপ গাইন, 'বন, বনবিনাশ ও বনভূমিতে বিদেশীপ্রজাতির আগ্রাসন', ফিলিপ গাইন (সম্পাদিত), *বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম,* ঢাকা: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ২০০৪, পৃষ্ঠা: ৬।

উৎপাদনের জন্য। অন্যদিকে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য সৃষ্ট কৃত্রিম হ্রদে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে ভালো কৃষি জমির ২৫০ বর্গমাইল এলাকা ডুবে যায়। এর বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব পরবর্তীতে লক্ষ করা যায়।[৩০]

সরকারি বন বিভাগ ও তার সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও তাদের অঙ্গ সংগঠনসমূহের মতে বন বিনাশের কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যাপক দারিদ্র্য, ভূমিহীন মানুষের বনের দিকে অভিগমন, জুমচাষ এবং বন সম্পদের অনুপযুক্ত ব্যবহার। এছাড়া পশুচারণ ভূমি হিসেবে বনভূমির ব্যবহার, অবৈধ বৃক্ষ কর্তন, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, বন সম্পদের নিয়ন্ত্রণহীন ও বিবেচনাহীন বাণিজ্যিক ব্যবহারকেও বন বিনাশের কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই বন বিনাশের সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি বনের উপর চাপ সৃষ্টি করে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু জনসংখ্যার চাপ ও দারিদ্র্য বন বিনাশে কতটুকু দায়ী সে ব্যাপারে গভীর পর্যালোচনা জরুরি।

প্রধানত উনিশ শতকের শেষ পঞ্চাশ বছর (১৮৫০-১৯০০) ধরে ব্রিটিশ শাসকরা বৃক্ষ সম্পদ লোপাট করে সবচেয়ে বেশি। শিল্পায়নের অগ্রগতির সাথে কাঠের চাহিদা বাড়তে থাকে। রেলওয়ের স্লিপারের জন্য কাঠের তীব্র চাহিদা এর একটি উদাহরণ। বনের উপর সমষ্টির মালিকানা উপেক্ষা করে দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র বনভূমিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে নেয়া হয় এবং বৃটিশ শাসকেরা সর্বসাধারণের সম্পত্তি লক্ষ লক্ষ হেক্টরের বনভূমি উজাড় করে ফেলে। আর এভাবেই এশিয়ার বনসম্পদ পাড়ি জমায় পশ্চিমা দেশগুলোতে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটলেও এশিয়া থেকে বনসম্পদ পশ্চিমাদেশে যাওয়া বন্ধ হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং জাপান উষ্ণ অঞ্চলের দেশগুলো থেকে রপ্তানি করা কাঠের প্রধান গ্রাহক। এই পশ্চিমা ভোক্তাদের কাঠ, মন্ড ও কাগজের চহিদা পূরণ করতে যেয়ে নিঃশেষ হয় এশিয়া ও গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশসমূহের বৃক্ষ সম্পদ। এসব দেশের মানুষ বনজ সম্পদ থেকে তৈরি নানা বিলাস সামগ্রীর একটা ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহার করলেও বনসম্পদ বিনাশের কুফল ভোগ করে পুরোটাই।[৩১]

বন বিনাশ, বনের বাণিজ্যিকীকরণ, নগরায়ণ, সরকারি বনভূমির মালিকানায় ও ব্যবহারে ব্যাপক পরিবর্তন, বিদেশী প্রজাতির আগ্রাসন, কলা ও আনারসের আগ্রাসন, রাবার চাষ ইত্যাদির ফলে পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে তার ফলে নারীরা সব থেকে বেশি প্রভাবিত ও প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ছেন। বন বিনাশের ফলে বন নির্ভর স্থানীয় মানুষের অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, তাদের কৃষ্টি ও মনোজগতের পরিবর্তন আনছে। পরিবেশের ক্ষতির ফলে নারীর উপর প্রতিকূল প্রভাব আদিবাসী এবং বাঙালির ওপর সমানভাবে পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে যেখানে আদিবাসী সমাজ বেশি খোলামেলা এবং বনের উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল সেখানে আদিবাসী নারীরা পরিবেশ বিপর্যয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।[৩২]

বন বিনাশের নানাবিধ কারণের মধ্যে বন প্রশাসনের নানাবিধ দুর্বলতা, যেমন দক্ষ জনবলের অভাব, প্রয়োজনীয় বাজেট ও লজিস্টিক সাপোর্টের অভাব, বন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রভৃতি মুখ্য কারণ হিসেবে বিভিন্ন প্রতিবেদনে আলোচিত হয়েছে। ফিলিপ গাইনের মতে সরকারি প্রশাসনের এই সকল দুর্বলতাকে ব্যবহার করে একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ বছরের পর বছর ধরে দেশের বনাঞ্চল ধ্বংসে নিয়োজিত রয়েছে। ১৯৮৫ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বনাঞ্চল থেকে গাছ কাটার উপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই নিষেধ মানা হয়নি কখনও।[৩৩]

প্রায়শ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীর নানা ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম, যেমন অবৈধ কাঠ পাচারে সহযোগিতা, আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে নামমাত্র মূল্যে উদ্ধারকৃত চোরাইকাঠের নিলাম, বনজ সম্পদ আহরণকারীদের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত ফি অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ আদায়, সরকারি রাজস্ব আত্মসাৎ, বন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগ, পোস্টিং ও বদলির ক্ষেত্রে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের খবর পাওয়া যায়। দুর্নীতির কারণে সরকারের এ বিভাগের ভাবমূর্তি জনগণের কাছে বিতর্কিত।

বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন বনাঞ্চলে বন বিভাগ কর্তৃক কার্যকর বন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, নানাবিধ সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা অনুসন্ধানে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

ক. বাংলাদেশে বৈশ্বিক উষ্ণতার নেতিবাচক প্রভাব কমানো ও টেকসই পরিবেশের উন্নয়নে প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের সংরক্ষণ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনায় বন বিভাগে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়ম দূরীকরণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এই সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

খ. বাংলাদেশে ক্রমহ্রাসমান প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সংরক্ষণে ও বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত বন বিভাগে বিদ্যমান অনিয়ম এবং দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা সম্পর্কিত কোনো বাস্তবভিত্তিক গবেষণা ইতোপূর্বে করা হয়নি।

[৩০] ফিলিপ গাইন, ২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৪৬।

[৩১] ফিলিপ গাইন, ২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৪৩।

[৩২] ফিলিপ গাইন, ২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৮০।

[৩৩] ফিলিপ গাইন, ২০০৪, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭২।

গ. টি.আই.বি প্রকাশিত করাপশন ডাটাবেজ ২০০৪ ও ২০০৫ অনুসারে বন বিভাগ অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত খাত।[৩৪]

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

ক. বন বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ।
খ. সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে বনজ সম্পদ আহরণে বিদ্যমান অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা লাভ।
গ. প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় মূলত গুণগত (Qualitative) তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং প্রকাশনা থেকে বন বিভাগের বিভিন্ন সমস্যা ও দুর্নীতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া বন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, কাঠ ব্যবসায়ী, স'মিলের মালিক ও কর্মচারী, অবৈধ কাঠ বহনকারী পরিবহণের চালক ও শ্রমিক এবং জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এ গবেষণা ডিসেম্বর ২০০৬ থেকে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদন করা হয়।

১.৫ সংগৃহীত তথ্যের উৎস

ক. পরোক্ষ তথ্যের উৎস:

বিভিন্ন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধ, বই, পত্র-পত্রিকা ও ইন্টারনেটে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং বন বিভাগ কর্তৃক সরবরাহকৃত বিভিন্ন তথ্য সংকলন।

খ. প্রাথমিক তথ্যের উৎস:

বর্তমান গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা এলাকায় ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন এবং কেস স্টাডির মাধ্যমে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৬ গবেষণার এলাকা

ক. চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সংরক্ষিত বনাঞ্চল (সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত লোহাগড়া, আমিরাবাদ, চকরিয়া, লামা, আলিকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি ও বান্দরবান)

খ. ঢাকা কেন্দ্রীয় বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত মৌলভীবাজর, হবিগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ বন বিভাগ

গ. সুন্দরবন

১.৭ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

ক. সময় ও সম্পদের স্বল্পতা এবং পরিধির ব্যাপকতার কারণে বাংলাদেশ বন বিভাগের আওতাভুক্ত সব ধরনের বনাঞ্চল, যেমন উপকূলীয় বনাঞ্চল, সামাজিক বনায়ন এবং বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগসমূহ এবং বিভিন্ন প্রকল্প বর্তমান গবেষণার আওতাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। একই কারণে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সকল অঞ্চলও এই গবেষণায় আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।

খ. টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সুনির্দিষ্ট ও সংরক্ষিত সীমানা না থাকায় এবং চতুর্দিক লোকালয়বেষ্টিত হওয়ায় ভূমিদস্যুতা ভিন্ন অন্যান্য বিষয়, বিশেষ করে কাঠ চুরি বা পাচারের প্রক্রিয়া ও মাত্রা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি।

গ. অবৈধভাবে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভূমি দখলের পরিমাণের ক্ষেত্রে বন বিভাগ কর্তৃক তথ্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থা ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

ঘ. দুর্নীতি সংক্রান্ত ঘটনায় উভয়পক্ষই লাভবান হওয়ায় সকল ক্ষেত্রে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের প্রকৃত পরিমাণ জানা সম্ভব হয়নি। তবে আনুমানিক পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

ঙ. বন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যালয় হতে তথ্য সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহে অসহযোগিতার কারণে বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান উপস্থাপন ও তার বিশ্লেষণ সম্ভব হয়নি।

---

[৩৪] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ প্রকাশিত 'করাপশন ডাটাবেজ ২০০৪ ও ২০০৫' অনুসারে উভয় বছরেই বনবিভাগ 'অধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। উল্লেখ্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে খাতওয়ারি দুর্নীতির অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগকে 'সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত', 'অধিক দুর্নীতিগ্রস্ত খাত', 'মধ্যম দুর্নীতিগ্রস্ত খাত' ও 'স্বল্প দুর্নীতিগ্রস্ত খাত' মোট চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অন্যদিকে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে ২০০৪ সালে বনবিভাগ চতুর্থ সর্বোচ্চ ও ২০০৫ সালে তৃতীয় সর্বোচ্চ অবস্থানে ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বন ব্যবস্থাপনার ইতিহাস ও বর্তমান কাঠামো

২.১ বন বিভাগ সৃষ্টির ইতিহাস এবং ক্রমবিকাশ:

বন বিভাগ শতাব্দীর ঐতিহ্য মন্ডিত একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। ভারত-বাংলাদেশের বনাঞ্চলের প্রারম্ভিক ইতিহাসের বর্ণনা পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব ৩২১ সালে রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী চানক্য রচিত 'অর্থশাস্ত্র' এবং খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩ হতে খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৬ সালে সম্রাট অশোক রচিত 'পান্ডুলিপি'তে (Inscription of Ashoka)।[৩৫] রাজা চন্দ্রগুপ্তের আমলে কোষাধ্যক্ষের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ বন বিভাগ চালু ছিল। এই কোষাধ্যক্ষকে সহায়তা করতেন বেশ কয়েকজন বনপাল বা বনরক্ষী, যাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তৎকালীন বন আইনে পরিষ্কার উল্লেখ ছিল।[৩৬] মৌর্য আমলে বনাঞ্চলসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণদের জন্য দানকৃত বনাঞ্চল, সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও জনসাধারণের বনাঞ্চল। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভিতর আবার দুই ভাগ ছিল, রাজার শিকারের জন্য সংরক্ষিত এবং কোষাধ্যক্ষের অধীন সরকারি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। সরকারি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে আগুন ধরানো বা গাছ কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। মৌর্য আমলে সরকারি নীতি ছিল বন সংরক্ষণে সহায়ক। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দশী এবং প্রতিপাদ্য দিবসে জীব হত্যা নিষিদ্ধ ছিল।[৩৭]

মৌর্য শাসনামলের পর কুশান এবং তারও পরে গুপ্ত সম্রাজ্যের সূচনা হয়। ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় পর্যায়ে গুপ্ত রাজ্যের শাসন চলে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পুরোটা সময় জুড়ে বন ছিল সরকারি রাজস্ব আয়ের অন্যতম প্রধান খাত। বনরাজস্ব আদায়ের জন্য 'গোলমিকাস' নিয়োগ দেওয়া হয়। সেই সময়ে বন হতে কাঠ, বাঁশ, বেত, ওষধিগাছ ও হাতি সরবরাহ করা হতো। বাংলায় পাল বংশের শাসন চলে ৮০০ থেকে ১৪০০ সাল পর্যন্ত। এই সময় ভারতীয়-বাংলা অঞ্চল অসংখ্য স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৩৮] এই সময়ের পুরোটা জুড়েই অতিরিক্ত কাঠ সংগ্রহ, বনভূমিকে রূপান্তরের মাধ্যমে ভূমির অন্যান্য ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সামন্ত যুদ্ধের কারণে বনে আগুন ধরানো ইত্যাদি বিবিধ কারণে বনাঞ্চলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। মুঘল শাসনামলে (১৫২৩-১৭০০) এই উপমহাদেশ পুনরায় কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে শাসিত হয়। এই সময় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় বন পরিষ্কার করে কৃষি জমির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। এছাড়া ঢাকার গেম রিজার্ভ বা শিকার গাহকে পাহাড়ী বনাঞ্চল থেকে সরবরাহকৃত কাঠের সাহায্যে জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়।[৩৯]

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে এই অঞ্চলে জাহাজ নির্মাণ ও রেলের স্লিপার তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বনজ সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার বনের অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। বনজ সম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে তদানীন্তন সরকার ১৮৬২ সনে এ অঞ্চলে বন অধিদপ্তর সৃষ্টি করে।[৪০] বিহার, উড়িশ্যা, বাংলা ও আসামের 'কনজারভেটর অব ফরেস্ট' হিসেবে ১৮৬৪ সালে এম.বি.এন্ডারসনের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলায় বন সংরক্ষণ শুরু হয়। সংরক্ষিত ও রক্ষিত বন সংক্রান্ত প্রথম আইন ১৮৬৫ সনে প্রণীত 'ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্ট'। এরই ধারাবাহিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সংরক্ষিত বনাঞ্চল সুনির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্য ১৮৬৯ সালে একজন 'অ্যাসিসট্যান্ট কনজারভেটর অব ফরেস্ট' নিয়োগ দেয়া হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মোট ৬,৮৮২ বর্গ মাইল এলাকার মধ্যে ৫,৬৭০ বর্গ মাইল এলাকাকে সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। ১৮৭২ সালে স্যার উইলিয়াম স্লিচকে বাংলার 'কনজারভেটর অব ফরেস্ট' হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তার নিয়ন্ত্রণে পাঁচটি বন বিভাগ ছিল- কোচ বিহার, আসাম, ঢাকা, চিটাগাং, ও ভাগলপুর।[৪১] বেঙ্গল ফরেস্ট ডিভিশনকে দার্জিলিং, পালামৌ, জলপাইগুড়ি, সুন্দরবন ও চট্টগ্রাম- এই পাঁচটি বন বিভাগে বিভক্ত করে ১৮৭৬ সালে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। ১৮৬৫ সালের ইন্ডিয়ান ফরেস্ট অ্যাক্টের স্থলে ১৮৭৮ সালে দ্বিতীয় আরেকটি অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়।

---

[৩৫] A.P.Dwivedi, *Foreestry in India,* Dehra Dun: Jugal Kishore and Company. 1980 (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

[৩৬] A.Kamal, M.Kamaluddin, and M.Ullah, *Land Policies, Land Management and Land Degradation in the HKH Region: Bangladesh Study Report*, Kathmandu, Nepal: ICIMOD, 1999. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

[৩৭] A.P.Dwivedi, 1980, Opcit.

[৩৮] Ibid.

[৩৯] G.M.Khattak, 'History of Forest Management in Bangladesh', *Pakistan Journal of Forestry 29.* 1979 (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

[৪০] পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, *বন অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সাফল্য*, ২০০৫, পৃ. ২।

[৪১] A.P.Dwivedi, 1980, Opcit.

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলসমূহকে ১৯৫৪ সালে সরকারি নোটিশ নং ৪৩৫৬ এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর ও পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ নামে পৃথক দুটি বন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪২] পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের অধীনে ছিল কাসালং সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও মাইনীমুখ সংরক্ষিত বনাঞ্চল, যা যথাক্রমে ১৮৮১ ও ১৮৭৫ সালে সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়।[৪৩] অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ গঠিত হয় ছয়টি সংরক্ষিত এলাকা যথা রাইনখিয়ং, থেগা, শুভলং, সীতা পাহাড়, রামপাহাড় ও বরকল সংরক্ষিত বনাঞ্চল নিয়ে। এই এলাকাগুলোর মধ্যে সীতাপাহাড় ও রামপাহাড় ১৮৭৫ সালে, রাইনখিয়ং, থেগা, শুভলং-এই তিনটি এলাকা ১৮৮২ সালে এবং সবশেষে ১৯২১ সালে বরকলকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।[৪৪] পাবর্ত্য চট্টগ্রাম উত্তর এর অন্তর্ভুক্ত সংরক্ষিত বনাঞ্চলসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্ব উত্তরে একসাথে অবস্থিত এবং এর হেডকোয়ার্টার ছিল রাঙ্গামাটিতে। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণের অন্তর্ভুক্ত বনাঞ্চল রাঙ্গামাটি জেলার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। সর্ব দক্ষিণ-পূর্বে ভারত ও মায়ানমার সীমান্তে রাইনখিয়ং সংরক্ষিত বনাঞ্চল অবস্থিত।

গেজেট নোটিফিকেশন অনুসারে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগের মোট আয়তন ছিল ৪,৩৪,৩১৬.৮০ একর। তবে কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টির পর কাসালং পুনর্বাসন জোন প্রতিষ্ঠার জন্য ২৬,০২৬ একর জায়গা ডিরিজার্ভ করা হয়। গেজেট নোটিফিকেশন ও প্রকৃত আয়তনের মাঝে প্রায় ১,৭৪৮.৮০ একর জমির হিসেবে গরমিল বিদ্যমান।[৪৫] ধারণা করা হয়, জরিপ পদ্ধতির ত্রুটির কারণে এই পরিমাণ আয়তনের গরমিল হয়েছে। অন্য দিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের মোট আয়তন ২,০৫,৪৫১ একর। গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী সীতাপাহাড় রিজার্ভের আয়তন ছিল ১৪,৪৪৮ একর। ১৯৬৫ সালে সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত কাপ্তাই শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠার জন্য ১০০ একর ডি-রিজার্ভ করা হয়। বাকি ১৪,৩৪৮ একরের মধ্যে ১৩০ একর জমি পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার কোনো হিসাব এখন পর্যন্ত করা হয়নি। এছাড়া সীতাপাহাড় রিজার্ভের মধ্যে মূল কর্ণফুলী নদীর ২৯২ একর অনুৎপাদনশীল জায়গা অন্তর্ভুক্ত। রাঙ্গামাটিতে ২৫৬ একর জমির একটি সংরক্ষিত এলাকা ছিল যা পরে সম্পূর্ণভাবে উজাড় করে রাঙ্গামাটি পুরাতন বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪৬] তবে কোনো গেজেট নোটিফিকেশন এজন্য করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বনায়ন প্রথম করা হয় ১৮৭১ সালে। তৎকালীন সময়ে কর্ণফুলী নদীর মাধ্যমে শুধুমাত্র সীতাপাহাড় অঞ্চলে যাওয়া যেতো এবং চট্টগ্রাম থেকে ঐ অঞ্চলে নদীপথে যাওয়ার জন্য দুইদিন সময় লাগতো। পরবর্তীতে কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টির পর এই অঞ্চলের বিভিন্ন বনাঞ্চলে প্রবেশ অনেক সহজ হয়ে যায়। কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প এই সংরক্ষিত এলাকার ভিতরে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এছাড়া পানির স্তর বৃদ্ধির কারণে কিছু অংশ পানির নিচে তলিয়ে যায় এবং রাস্তা, শিল্প এলাকা ও অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে আরও কিছু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর সীতাপাহাড় সংরক্ষিত এলাকায় এই অঞ্চলের প্রথম বনায়ন কার্যক্রমের সূচনা হয়। রাইনখিয়ং সংরক্ষিত অঞ্চলে দুর্গমতার কারণে ১৯২০ সালের পূর্বে কোনো বনায়ন কার্যক্রম আরম্ভ হয়নি। ১৯২০ সনে মাত্র ৫ একর জায়গা নিয়ে প্রথম বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে পঞ্চাশের দশকে কর্ণফুলী পেপার মিল ও ষাটের দশকে ফরেস্ট ইন্ডাষ্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই অঞ্চলে বনায়ন ও বন সম্পদ আহরণ ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে এই বন বিভাগের কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি পায় কাপ্তাই হ্রদের মাধ্যমে যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায়।

১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি পৃথক জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও ১৯০৯ সাল পর্যন্ত এই জেলার বন বিভাগের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হতো চট্টগ্রাম বন বিভাগ থেকে। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের সকল সংরক্ষিত বনাঞ্চল চট্টগ্রাম বন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময় সর্বপ্রথম বন সংরক্ষণ ও কৃত্রিম বনায়নের সফল সূচনা হয়। এই সময়ে বন বিভাগের উদ্যোগ, পরিশ্রম ও উৎসাহের কারণেই এই অঞ্চলে সৃষ্টি হয় এক সমৃদ্ধ বনাঞ্চল। ১৮৭৫ সালে সর্বপ্রথম কোনো বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত ঘোষণা করা হলেও বন সম্পর্কিত কার্যক্রম শুরু হয় আরো পূর্বে ১৮৬২ সালে নদী পথে টোল স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে। তৎকালীন সময়ে জেলা কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রথম টোল সংগ্রহ শুরু হলেও ১৮৬৪ সালে এই দায়িত্ব দেয়া হয় পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী প্রধানকে। তবে ১৮৭১ সালে পুনরায় বন বিভাগ এই টোল সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করে।[৪৭]

১৯০৯ সালে চট্টগ্রাম বন বিভাগকে বিভক্ত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার সময়ে কাসালং, রাইনখিয়ং, সীতাপাহাড়, মাতামুহুরী ও সাংগু অঞ্চলের ১০৬৫ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে গঠিত হয়। অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চলের

---

[৪২] Directorate of Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh. *Working Plan For Chittagong Hill Tracts North Forest Division. For The Years 1969-70 to 1988-89. Vol. I.* Dhaka, 1974.
[৪৩] Ibid.
[৪৪] Forest Department, Government of the People's Republic of Bangladesh. *Working Plan For Chittagong Hill Tracts South Forest Division. For The Years 1969-70 to 1988-89. Vol. I.* Dhaka, 1973.
[৪৫] Directorate of Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh. *Working Plan For Chittagong Hill Tracts North Forest Division. For The Years 1969-70 to 1988-89. Vol. I.* Dhaka, 1974.
[৪৬] Forest Department, Government of the People's Republic of Bangladesh, 1973, Opcit.
[৪৭] Directorate of Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh, 1974, Opcit.

আয়তন ছিল ৪০৩০ বর্গ মাইল। চট্টগ্রাম বন বিভাগের অধীনে চট্টগ্রাম জেলার বাড়ৈয়াঢালা-করেরহাট অঞ্চলকে সর্বপ্রথম ১৮৯৩ সালে সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯২০ সালের এপ্রিলে এই বন বিভাগকে পুনর্বিন্যস্ত করার মাধ্যমে কক্সবাজার বন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং মাতামুহুরি বনাঞ্চলকে কক্সবাজার বন বিভাগের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৪৮] একই সময়ে সাংগু রিজার্ভকে চট্টগ্রাম বনাঞ্চলের অধীনে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। পুনরায় ১৯৩৩ সালে কক্সবাজার বন বিভাগকে চট্টগ্রাম বন বিভাগের সাথে একীভূত করা হয়। গেজেট নোটিফিকেশন নং ৬০৩৩ এর মাধ্যমে ১৯৫১ সালে কক্সবাজারকে আবারও চট্টগ্রাম বন বিভাগ থেকে আলাদা করা হয়। এই সময় মাতামুহুরি রিজার্ভ ফরেস্টকে কক্সবাজার বন বিভাগের অধীনে এবং সাংগু রিজার্ভকে চট্টগ্রাম বন বিভাগের অধীনে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়।[৪৯]

অবিভক্ত বাংলার প্রথম দিকে যে সকল বন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয় চট্টগ্রাম বন বিভাগ তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্তির পর চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা, সুন্দরবন এবং আসাম বন বিভাগের একটি ছোট অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধীনে আসে।[৫০] ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে এই অঞ্চলের বনজ সম্পদের গুরুত্ব বেড়ে যায়। ১৯৫৩-৭৩ সাল পর্যন্ত একটি 'ওয়ার্কিং প্লান' এ.এস.এম. জহির উদ্দিন তৈরি করেন। এই কার্য পরিকল্পনার অনুসারেই 'ফরেস্ট ইন্ডাষ্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন' তৈরি করা হয়। এছাড়া এই সময় কর্ণফুলী পেপার মিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই অঞ্চলের বাঁশকে কাজে লাগানো হয়। ১৯৬৫ সালে কানাডিয়ান সরকারের সহযোগিতায় এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম বনাঞ্চলের ভূ-সম্পদের বনজরিপ সম্পাদন করা হয়।

সুন্দরবনের ইতিহাসও খুব বেশি দিনের পুরনো নয়। বর্তমান সুন্দরবনের জোয়ার বিধৌত অংশ ৫ম থেকে ৭ম শতাব্দীতে স্থিতি লাভ করে, যদিও ভারত-বাংলাদেশে অবস্থিত ১০,০১৭ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে অবস্থিত সুন্দরবনের প্রাচীন অংশ ছয় হাজার বছর ধরেই তৈরি হয়েছে। এই অঞ্চলে মানব বসতির বিস্তার শুরু হয় রাজা অশোকের শাসনামলে (খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২)। এই অঞ্চলের প্রথম বসতি স্থাপনকারীরা ছিলো জেলে সম্প্রদায়ের 'পদ' ও 'চন্ডাল' বংশের অন্তর্ভুক্ত যারা খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। একাদশ শতকের প্রথমদিকে মহামারী এবং নদীর গতিপথ পরিবর্তনজনিত কারণে এই বসতি স্থাপন প্রক্রিয়া সর্বপ্রথম বাধাগ্রস্ত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম সুলতানদের শাসনামলে পীর ও সুফিদের ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে এই অঞ্চলের বন পরিষ্কার করে কৃষি জমি ও মনুষ্য বসতি সম্প্রসারণের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

১৭৫৭ সনে মুঘল সম্রাট আলমগীরের (২য়) কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই অঞ্চলের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ১৭৬৪ সনে সর্বপ্রথম সুন্দরবনের সীমানা চিহ্নিত করা হয়। ১৮২৮ সনে ব্রিটিশ সরকার সমগ্র সুন্দরবনের স্বত্ত্ব অধিগ্রহণ করে এবং অধিক রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যে বন আবাদ করে কৃষি জমিতে রূপান্তরের শর্তে বনভূমি ইজারা দেয়া শুরু করে। বন বিনাশের এই প্রক্রিয়া ১৮৭৫-৭৬ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[৫১] মূলত এই সময়েই সুন্দরবনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধিত হয়।

১৮৬২ সনে বার্মার বন সংরক্ষক ড. ব্রান্ডিস সর্বপ্রথম এই বনাঞ্চলকে সংরক্ষণের দাবি তোলেন। তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতেই নতুন করে বনভূমি লীজ দেয়া বন্ধ হয়। সরকারিভাবে বনভূমি লীজ দেয়া বন্ধ হলেও বনবিনাশ থেমে থাকেনি। ১৮৭৩ পর্যন্ত প্রায় ৫১০০ বর্গ কি.মি. বনভূমিকে আবাদের মাধ্যমে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করা হয়। তবে পরবর্তীতে বনজ সম্পদ ও বনজ উৎপাদন কৃষিজ উৎপাদন অপেক্ষা বেশি লাভজনক প্রতীয়মান হওয়ায় বনভূমি লীজ দেয়ার নীতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ বন সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও অধিক হারে রাজস্ব আদায়ের বিবেচনাই ছিল মুখ্য। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৫-৭৬ সনে সমগ্র অবিলিকৃত বনভূমিকে বন আইন VII, ১৮৬৫ অনুসারে সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয় এবং সমগ্র সুন্দরবনকে বন বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। ১৮৬৯ সনে সুন্দরবনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে এই অঞ্চলে বন ব্যবস্থাপনা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুন্দরবনের বিজ্ঞানভিত্তিক সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে আর.এল.হাইনিগ (R.L. Heinig) সর্বপ্রথম ১৮৯৩-৯৪ থেকে ১৯০৩-০৪ সালের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। লয়েড (Loyed) ১৯০৪-০৬ সনের জন্য দ্বিতীয় এবং স্যার ফারিংটন (Sir Henry Farrington) ১৯০৬-১০ সনের জন্য তৃতীয় কর্মপরিকল্পনা করেন। ১৯১১ সালে প্রণীত ট্রাফোর্ড এর কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী দুই দশক অর্থাৎ ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সুন্দরবন সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ১৯২৬ সালে এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। বর্তমানে অবশিষ্ট সুন্দরবন মূলত এই সকল সিদ্ধান্তেরই ফলাফল। ১৯৩১ সনে এস.জে.কার্টিস (S.J. Curtis) সর্বপ্রথম ভূমি ও বনজ সম্পদ জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা

[৪৮] J.M.Cowan, *Working Plan for the Forests of The Cox's Bazar Division, Bengal,* Calcutta, 1923

[৪৯] Forest Department, Government of East Pakistan, *Working Plan of Sangu and Matamuhuri reserved Forests. For The period from 1967-68 to 1986-87. Vol. I.* Dhaka, 1970.

[৫০] A.N.M.A.Wadud, 'Need for change in Forest Act 1927', Review Paper No. 111. Institute of Forestry, University of Chittagong, Bangladesh, 1989 (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

[৫১] Sumit Sen, 'A brief history of the Sundarbans', 2007. http://www.kolkatabirds.com/sunderhistory.htm. Accessed on 05 May 2008.

তৈরি করেন।[৫২] বিংশ শতাব্দীতে ত্রিশের দশকের পর এবং ভারত বিভাগ পরবর্তী সময়েও উত্তরাধিকার সূত্রে উৎপাদনমুখী কার্টিসের কর্মপরিকল্পনা অনুসারেই বন ব্যবস্থাপনা হয়ে আসছিলো। ১৯৬০ সনে ফরেস্ট্র্যাল ফরেস্টি কর্তৃক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে পরিচালিত বন জরিপের উপর ভিত্তি করে এ.এম. চৌধুরী ১৯৬০-৮০ সালের জন্য পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেন।[৫৩]

১৯৭৭ সালে 'বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭৪' অনুসারে সুন্দরবনের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে মোট ৩২,৪০০ হেক্টর এলাকা নিয়ে তিনটি বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৭ সনে জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কো এই তিনটি অভয়ারণ্যকে 'ওর্য়াল্ড হেরিটেজ সাইট' হিসেবে ঘোষণা দেয়।

সুন্দরবন ও চট্টগ্রামের পাহাড়ী বনাঞ্চলের পর দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বনাঞ্চল হচ্ছে মধুপুরের শাল বন। একে দেশের মধ্যাঞ্চলীয় বন হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাংগাইল জেলার অংশ জুড়ে এই বনাঞ্চল বিস্তৃত। বৃটিশ রাজত্বে মধুপুর বনাঞ্চল নাটোর জমিদারের তালুক হিসেবে পরিগণিত হয়। ফকির ও সন্ন্যাস আন্দোলনের সূতিকাগার মধুপুর বনাঞ্চলের বিদ্রোহী তৎপরতা দমন করতে ব্রিটিশ সরকার ১৭৮৭ সালে ময়মনসিংহকে জেলা ঘোষণা করেন। ১৯৫১ সালে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর মধুপুর বনাঞ্চলকে সরকার বন বিভাগের আওতায় ন্যস্ত করে। ১৯৮৮ সালে মধুপুর বনাঞ্চলকে ময়মনসিংহ বন বিভাগ থেকে আলাদা করে টাংগাইল বন বিভাগের আওতায় আনা হয়। ১৯৮২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সরকার এক গেজেট বলে ২০ হাজার ৮৩৭ একর বনভূমি নিয়ে মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক স্থাপন করে। আবার পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে বন মন্ত্রনালয় জাতীয় সদর উদ্যানের ৩ হাজার একর বনভূমি নিয়ে ইকোপার্ক গঠনের ঘোষণা দেন। ইকোপার্কের বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণ নিয়ে আদিবাসী গারোদের সাথে পুলিশ ও বন রক্ষীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং প্রাণহানির (২০০৪ সালের ৩রা জানুয়ারী) ঘটনায় ইকোপার্কের কাজ সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

২.২ বনের ধরন ও আয়তন:

বাংলাদেশে ধরন অনুযায়ী মোট ভূমির পরিমাণ নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো:

সারণি ২.১: ধরন অনুযায়ী ভূমির পরিমাণ

শ্রেণী বিভাগ		ভূমির পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)		শতকরা হার (মোট ভূমির)
কৃষি ভূমি			৯.৫৭	৬৪.৮৮
বন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় বনভূমি	পাহাড়ী বন	০.৬৭	১.৫২	১০.৩১
	ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট *(প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম মিলিয়ে)*	০.৭৩		
	শালবন *(প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম মিলিয়ে)*	০.১২		
ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি			০.৭৩	৪.৯৫
গ্রামীণ বন			০.২৭	১.৮৩
চা ও রাবার বাগান			০.০৭	০.৪৭
শহর			১.১৬	৭.৮৬
জলাশয়			০.৯৪	৬.৩৭
অন্যান্য			০.৪৯	৩.৩২
মোট ভূমি			১৪.৭৫	১০০

সূত্র: বাংলাদেশ বন বিভাগ, ২০০৭।

বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ভূমির প্রায় শতকরা ১৭.০৮ ভাগ বনভূমি রয়েছে। এরমধ্যে সরকার বা বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বন ১.৫২ মিলিয়ন হেক্টর (১০.৩০%), জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন অশ্রেণীভুক্ত বন ০.৭৩ মিলিয়ন হেক্টর (৪.৯৫%) এবং গ্রামীণ বন ০.২৭ মিলিয়ন হেক্টর (১.৮৩%)। উপরে বর্ণিত বনভূমির মধ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক যে বনভূমি নিয়ন্ত্রিত হয় তার ধরন ও পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হলো:

বাংলাদেশের পাহাড়ী বন মূলত চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার ও সিলেট জেলায় অবস্থিত। এই পাহাড়ী বনের মোট আয়তন ৬,৭০,০০০ হেক্টর যা বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনের ৪৪% এবং বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৪.৫৪%। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনের মোট আয়তন ৬,০১,৭০০ হেক্টর, যা বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনের ৪০% এবং বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৪.০৭%।

[৫২] BFD, Ministry of Environment and Forest, FAO and Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization, Ministry of Defence, 2007, Opcit.

[৫৩] J.K.Choudhury, 'Sustainable management of coastal mangrove forest development and social needs', Presented in XI World Forestry Congress on 13 to 22 October 1997. Antalya, Turkey.

চিত্র ২.১: বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমি (মিলিয়ন হেক্টর)

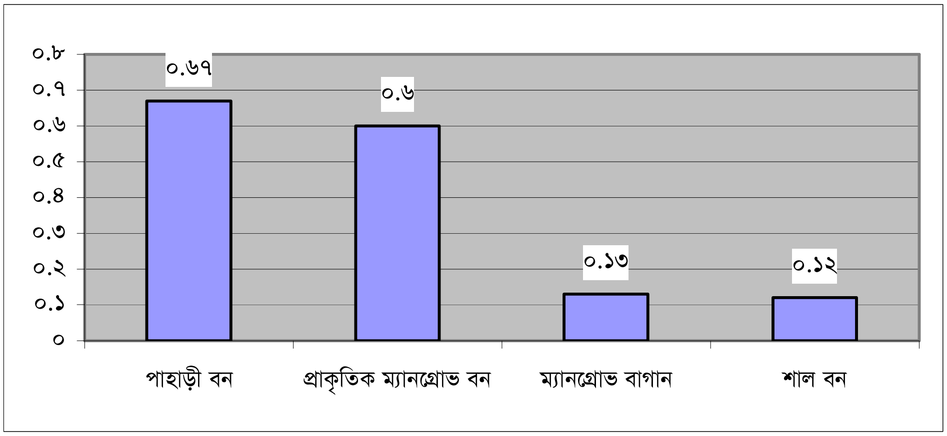

সূত্রঃ বাংলাদেশ বন বিভাগ, ২০০৮।

১৯৯৭ সালে সুন্দরবনের ১,৩৯,৭০০ হেক্টর এলাকা নিয়ে গঠিত তিনটি অভয়ারণ্যকে জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' হিসেবে ঘোষণা করে। সমতলের শালবন মূলত গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা, নওগাঁ, রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত। এই সকল শালবনের মোট আয়তন ১,২০,০০০ হেক্টর, যা বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনের ৭.৮৯% এবং বাংলাদেশের মোট আয়তনের ০.৮১%।

সারণি ২.২: সার্কেল বা বন বিভাগ এবং ধরন অনুযায়ী বনভূমির আয়তন (হেক্টর)

বনের ধরন	রাঙ্গামাটি সার্কেল	চট্টগ্রাম সার্কেল	সুন্দরবন সার্কেল	ঢাকা কেন্দ্রীয় সার্কেল	মোট
সংরক্ষিত বন	২৭৭,২৩০.২১	৩৩০,৬৯৩.৬৫	৬,০১,৭০০.০০	৭৫,৬২৩.৮৭	১,২৮৫,২৪৭.৭৩
রক্ষিত বন	৮,০৬৫.০৮	৩৩,৬১৪.৬৮	-	-	৪১,৬৭৯.৭৬
অর্জিত বন	-	৫,০৯৫.৮০	-	৪,৪২৪.০৭	৯,৫১৯.৮৭
অর্পিত বন	-	২,৬৩৬.৪০	-	-	২,৬৩৬.৪০
বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত অশ্রেণীভুক্ত	২০,৪১৬.০৮	১৫,৬৪৫.৬৫	-	-	৩৬,০৬১.৭৩
৪ ধারায় বিজ্ঞাপিত	-	-	-	৯৯,১৮০.৫৪	৯৯,১৮০.৫৪
উপকূলীয় বনভূমি	-	৩১,৭৬৭.৬০	-	-	৩১,৭৬৭.৬০
মোট	**৩০৫,৭১১.৩৭**	**৪১৯,৪৫৩.৭৮**	**৬০১,৭০০.০০**	**১৭৯,২২৮.৪৮**	**১,৫০৬,০৯৩.৬৩**

সূত্রঃ বাংলাদেশ বন বিভাগ, ২০০৮।

তবে দেশের মোট বনভূমির পরিমাণ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক এক জরিপে ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। ২০০৫-২০০৭ সালে এফএও এর সহযোগিতায় বন বিভাগ ও স্পার্সোর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত 'ন্যাশনাল ফরেস্ট এন্ড ট্রি রিসোর্সেস এ্যাসেসমেন্ট ২০০৫-০৭' শীর্ষক এই জরিপ অনুযায়ী দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ১.৪৪২ মিলিয়ন হেক্টর যা দেশের মোট ভূমির ৯.৮%। এর মধ্যে বন বিভাগের প্লান্টেশন বা সৃজিত বন, রাবার বাগান এবং বাঁশ বা মিশ্র ঘাস জাতীয় বনও অন্তর্ভুক্ত।[৫৪]

[৫৪] BFD, Ministry of Environment and Forest, FAO and Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization, Ministry of Defence, 2007, Opcit.

চিত্র: বাংলাদেশে বনের মানচিত্র

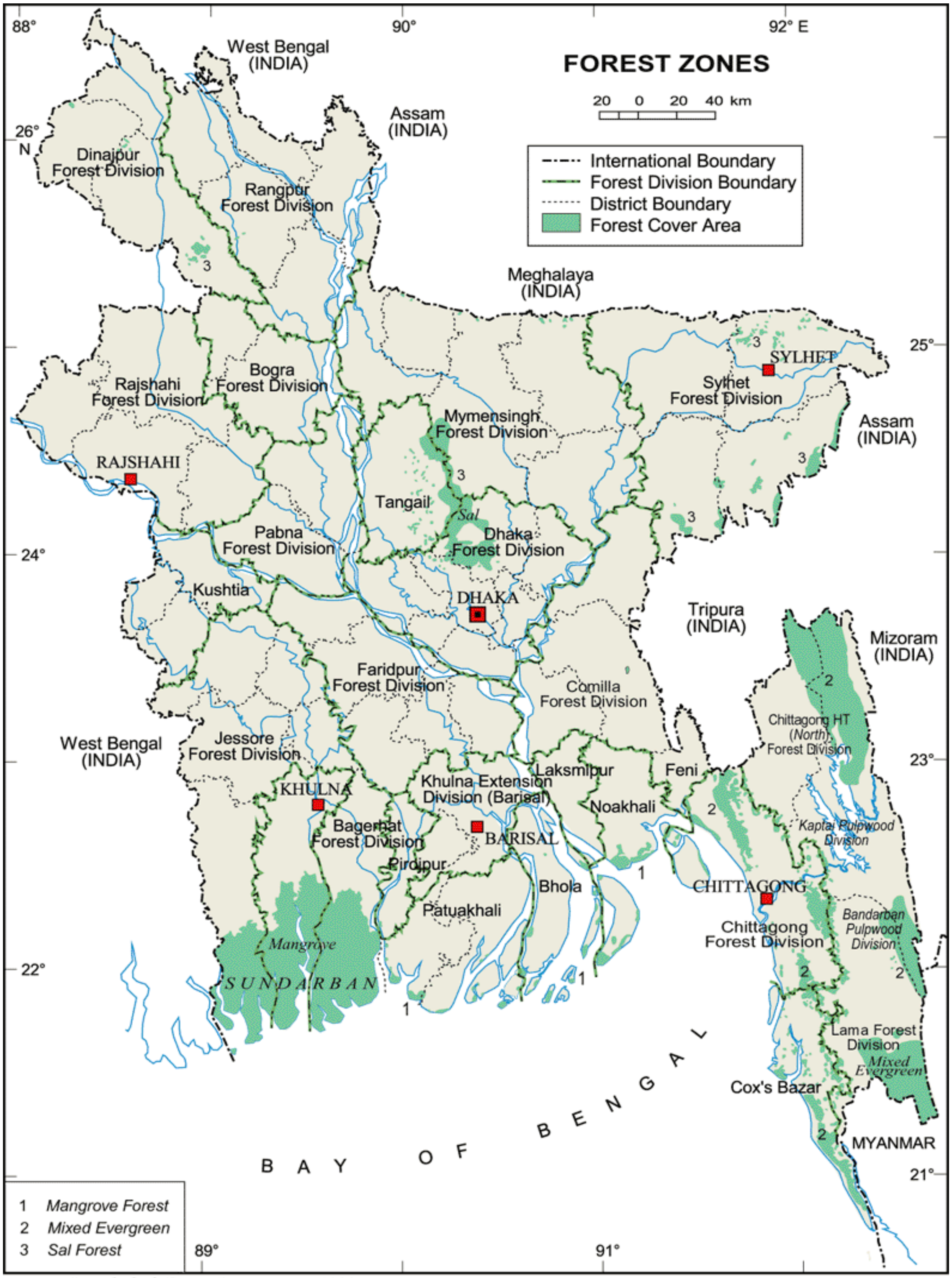

Source: *Bangladesh Forest Department, 1999*

সারণি ২.৩: এফএও, বন বিভাগ ও স্পার্সো পরিচালিত সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী বনভূমির পরিমাণ

	বনভূমির ধরন		ভূমির পরিমাণ (হেক্টর)	মোট ভূমির %	বনভূমির %
বনভূমি ৯.৭৮%	প্রাকৃতিক বনভূমি ৮.১৬%	পাহাড়ি বনভূমি	৫৫১,০০০	৩.৭৩	৩৮.১৮
		শাল বনভূমি	৩৪,০০০	০.২৩	২.৩৬
		ম্যানগ্রোভ বনভূমি	৪৩৬,০০০	২.৯৫	৩০.২১
		বাঁশ বা বাঁশপাতার বনভূমি	১৮৪,০০০	১.২৫	১২.৭৫
	সৃজিত বনভূমি ১.৬১%	দীর্ঘ আবর্তের সৃজিত বাগান	১৩১,০০০	০.৮৯	৯.০৮
		স্বল্প আবর্তের সৃজিত বাগান	৫৪,০০০	০.৩৭	৩.৭৪
		ম্যানগ্রোভ বাগান	৪৫,০০০	০.৩০	৩.১২
		রাবার বাগান	৮,০০০	০.০৫	০.৫৫
	মোট বনভূমির পরিমাণ		**১,৪৪৩,০০০**	**৯.৭৮**	**১০০.০০**
	মোট ভূমির পরিমাণ		**১৪,৭৫৭,০০০**		

সূত্র: ন্যাশনাল ফরেস্ট এন্ড ট্রি রিসোর্সেস এ্যাসেসমেন্ট ২০০৫-০৭, বাংলাদেশ বন বিভাগ[৫৫]

২.৩ বন ব্যবস্থাপনায় গৃহীত নীতি ও আইনসমূহ:

বাংলাদেশে বন নীতির উদ্ভব ও পরিবর্তন পর্যালোচনার মাধ্যমে দুইটি আন্তঃসম্পর্কযুক্ত ধারার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রথমত, এই সকল বন নীতির মাধ্যমে দেশের সকল বনাঞ্চলকে সরকারি বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে বনজ সম্পদের বাণিজ্যিকীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বন ও বনাঞ্চল সংলগ্ন স্থানীয় অধিবাসীদের বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।[৫৬]

বাংলাদেশের বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও বন ব্যবস্থাপনায় গৃহীত নীতিসমূহ ইতিহাসের বিভিন্ন সময় সংঘটিত বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত। বৃটিশ শাসিত ভারতের এই অঞ্চলে ১৮৯৪ সালে সর্বপ্রথম বন নীতি গ্রহণ করা হয়, যা পরে ১৯০৪ সালে পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়। ১৮৯৪ সালে ঘোষিত বন নীতিতে স্থানীয় জনগণের স্বার্থকে ভুলুণ্ঠিত করার মাধ্যমে বনাঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। তৎকালীন বন নীতিতে বন ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিলো রাজস্ব সংগ্রহ।[৫৭] বনভূমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তরের সুযোগ রাখার মাধ্যমে বন সংরক্ষণ অপেক্ষা কৃষিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সুযোগে তৎকালীন বাংলায় ব্যাপকভাবে বন উজাড় হয়।[৫৮] এই বন নীতিতে বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসানের পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তার প্রথম বন নীতি ঘোষণা করে ১৯৫৫ সালে এবং পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে পুনরায় সংশোধনের মাধ্যমে দ্বিতীয় বন নীতি গ্রহণ করে। বৃটিশ শাসন হতে স্বাধীনতা লাভ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পরও বন ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের ধরনে তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। ১৯৫৫ সালের বন নীতিতে পূর্বের ঔপনিবেশিক বন নীতির ধারাবাহিকতায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যগত কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। এই বন নীতিতেও সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন বনাঞ্চলের সম্প্রসারণ, বাণিজ্যিকভাবে কাঠ সংগ্রহ, বন প্রশাসনের বিদ্যমান আমলাতন্ত্র শক্তিশালীকরণ

---

[৫৫] BFD, Ministry of Environment and Forest, FAO and Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization, Ministry of Defence, 2007, Opcit.

[৫৬] N.A.Khan, 2001, Opcit.

[৫৭] L.M.Rahman, *History of Forest Conservation in Indo-Bangladesh*. Aranaya 2(2):21-24, 1993. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

[৫৮] N.A.Khan, 2001, Obcit.

এবং বিভাগীয় কর্ম পরিকল্পনার অধীনে বন ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।[৫৯] ১৯৬২ সালের সংশোধিত বন নীতিতেও অধিক হারে বনজ সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বন ব্যবস্থাপনা, বর্ধিত হারে বনজ সম্পদ আহরণের সুবিধার্থে দ্রুত বনজ সম্পদ উৎপাদনে ব্যবস্থা গ্রহণ, শিল্প বনায়ন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সুন্দরবন থেকে কাঠ সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়।

বৃটিশ শাসনামলের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান আমলেও বন ব্যবস্থাপনা ও এ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণের সুযোগ না রাখা, বনজ সম্পদের সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল শিল্প প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন বনাঞ্চলের সম্প্রসারণ প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য পায়। এক্ষেত্রে পূর্বের মতোই স্থানীয় জনগণের অধিকার ও দাবিকে উপেক্ষা করা হয়।

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭৭ সালে প্রথম জাতীয় বন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার দীর্ঘ আট (৮) বছর পর ১৯৭৯ সালে দেশের প্রথম বন নীতি ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৯৯৪ সালে সর্বশেষ বা বর্তমানে কার্যকর বন নীতি ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৯ সালে ঘোষিত বন নীতির মাধ্যমে বনাঞ্চল ও বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে সরকারের অন্যতম লাভজনক অর্থনৈতিক খাত বা রাজস্ব আদায়ের খাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে পূর্বের বন নীতির ধারাবাহিকতায় সরকারি বনাঞ্চলসমূহের কার্যকর শ্রেণীবিভাগ ও ব্যবহারের ধরন নির্ধারণ, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে বনভূমির ভূমিকা, বন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণ ও বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, বনজ সম্পদের ব্যবহার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, কাঠ ব্যতীত অন্যান্য বনজ সম্পদের গুরুত্ব, বন সম্প্রসারণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে এই বন নীতিতে উপেক্ষা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই বন নীতিতেও সামগ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন কৌশলকে উপেক্ষা করে গতানুগতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে।[৬০]

পক্ষান্তরে, বর্তমান বন নীতিতে (১৯৯৪) জনমুখী বন নীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনার মাধ্যমে বন ব্যবস্থাপনায় আধুনিক যুগের সূচনা হয়। বনায়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন, বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ এবং বন উন্নয়নে সমাজের বৃহৎ অংশের প্রতিনিধিত্বকে বর্তমান বন নীতিতে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে।[৬১] বর্তমান বন নীতির উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, গ্রামীণ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে বনায়ন, বন সংরক্ষণ, বিশেষ করে অবৈধভাবে বনভূমি দখল, কাঠ চুরি ও পাচার এবং বন্যপ্রাণী নিধন প্রতিরোধে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং স্থানীয় জনসাধারণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সামাজিক বনায়ন, গ্রামীণ বনায়ন ও ভূমিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অবদানের স্বীকৃতি প্রদান অন্যতম।

বাংলাদেশে ১৮৯৪ সালে বৃটিশ শাসক প্রবর্তিত বন নীতির উত্তরসূরী হিসেবে ১৯৫৫, ১৯৬২, ১৯৭৯ এবং সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে বিভিন্ন পরিমার্জন ও সংশোধনের মাধ্যমে বর্তমান বন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বৃটিশ প্রবর্তিত বন নীতিতে তাদের ঔপনিবেশিক মানসিকতার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলনের মাধ্যমে বন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণভাবে রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়েছিল। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা অবসানের সুদীর্ঘ ৬০ বছর পরও বর্তমান নীতিতে ঔপনিবেশিক চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। বর্তমান বন নীতিতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে টেকসই উন্নয়নে ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে বর্তমান বন নীতির কার্যকর প্রয়োগ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন এখনও সম্ভব হয়নি। বন সংরক্ষণ ও বন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কার্যক্ষেত্রে বর্তমান বন নীতির সফল প্রতিফলন সম্ভব।

বর্তমানে বাংলাদেশ বন বিভাগ যে সকল নীতি, আইন, ধারা ও বিধি দ্বারা বন ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে থাকে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪
২. বন আইন, ১৯২৭ (সংশোধিত ২০০০)
৩. বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭৩ (সংশোধিত ১৯৭৪)
৪. সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪
৫. ব্যক্তি মালিকানাধীন বন অধ্যাদেশ, ১৯৫৯

---

[৫৯] M.M.Hussain, 'Study on National forest Policy in Bangladesh', Mimeo, Forest Department, Dhaka, 1992. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

[৬০] M.K.Roy, 'Forest Sector Planning and Development in Bangladesh', Master of Forestry Dissertation, Department of Forestry, Australian National University, Canberra, 1987. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

[৬১] N.A.Khan, 2001, Obcit.

৬. আতিয়া বন (সংরক্ষণ) অধ্যাদেশ, ১৯৮২
৭. পূর্ব বাংলা মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০
৮. কাঁকড়া রপ্তানি বিধি, ১৯৯৮
৯. বাঁশ রপ্তানি নীতি, ১৯৯৯
১০. ইট ভাটা আইন, (সংশোধিত) ২০০১
১১. বন নির্দেশিকা (১ ও ২)
১২. নার্সারি ও বৃক্ষরোপণ নির্দেশিকা, ২০০৪
১৩. বনজদ্রব্য চলাচল বিধি, ২০০৮ (প্রস্তাবিত)

উপরেল্লখিত নীতি, আইন ও বিধিসমূহের মধ্যে জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪ এর আলোকে মূলত বন আইন, ১৯২৭ (সংশোধিত ২০০০) এর মাধ্যমে বন বিভাগ পরিচালিত হয়ে থাকে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আইন ও বিধিসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭৩ (সংশোধিত ১৯৭৪) এর সাহায্যে সংরক্ষিত অভয়ারণ্য, ইকোপার্ক, ন্যাশনাল পার্ক, সাফারি পার্ক, গেম রিজার্ভসমূহ অর্থাৎ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ পরিচালিত হয়। অনুরূপভাবে, সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪ অনুসারে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

২.৪ বন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

বৃটিশ শাসনামলে ১৮৬২ সনে বন অধিদপ্তর সৃষ্টির সময়ে ফরেস্ট সার্ভিস তিন ভাগে বিভক্ত ছিল যথা (১) 'ইম্পেরিয়াল ফরেস্ট সার্ভিস' (২) 'প্রভিনসিয়াল ফরেস্ট সার্ভিস' ও (৩) 'সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস'। ১৯১৩ সালের ফরেস্ট সার্ভিস কোডের বর্ণনা মোতাবেক 'ইম্পেরিয়াল সার্ভিস' এর পদসমূহ যথাক্রমে (ক) ইন্সপেক্টর জেনারেল অব ফরেস্ট, (খ) চীফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট, (গ) কনজারভেটর অব ফরেস্ট, (ঘ) ডেপুটি কনজারভেটর অব ফরেস্ট এবং (ঙ) অ্যাসিসট্যান্ট কনজারভেটর অব ফরেস্ট নামে পরিচিত ছিল। সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস গঠিত হয়েছিল (ক) ফরেস্ট রেঞ্জার, (খ) ডেপুটি রেঞ্জার, (গ) ফরেস্টার, (ঘ) ফরেস্ট গার্ড ও অন্যান্য পদের জনবল নিয়ে। সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস সমন্বয়ে পূর্ব পাকিস্তান ফরেস্ট সার্ভিস গঠিত হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্বে বাংলাদেশের বনাঞ্চল বাংলা ও আসাম বন বিভাগদ্বয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিল। ভারত বিভক্তির পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বন অধিদপ্তরের আওতায় ইস্ট পাকিস্তান সিনিয়র ফরেস্ট সার্ভিস এবং সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস সমন্বয়ে পূর্ব পাকিস্তান ফরেস্ট সার্ভিস গঠিত হয়।

১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর এ দেশের বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বন বিভাগের উপর অর্পিত হয়। তবে স্বাধীনতার পর সকল প্রকার ক্যাডার পদ বিলুপ্ত করার কারণে বন অধিদপ্তরের জন্য আলাদাভাবে সৃষ্ট ফরেস্ট সার্ভিসের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়। ১৯৮০ সনে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডার রুল প্রবর্তন করা হয় এবং এর আওতায় বি.সি.এস. (বন) ক্যাডার সৃষ্টি করার ফলে এ সমস্যার সমাধান হয়। এতে দেশে বন ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় হয়। ইতোপূর্বে এ অঞ্চলে বন অধিদপ্তর সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল সরকারিভাবে বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে তা থেকে রাজস্ব আয় করা। কিন্তু দিন দিন বনজ সম্পদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় আসায় ১৯৮৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয় এবং বন অধিদপ্তরকে নব সৃষ্ট পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।[৬২]

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বন বিভাগে 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ ফরেস্ট' পদ প্রতিষ্ঠা করা হলেও কিছুদিন পরই এই পদটি বিলুপ্ত করা হয়। তখন থেকেই একজন 'ডেপুটি চীফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট' এর সহযোগিতায় 'চীফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট' সমগ্র বন বিভাগ পরিচালনা করতেন। তখন বন বিভাগের মোট ৬টি সার্কেল ছিল। সেগুলো হলো কেন্দ্রীয় সার্কেল, পূর্বাঞ্চলীয় সার্কেল, প্লানটেশন সার্কেল, উন্নয়ন সার্কেল, বন্যপ্রাণী সার্কেল এবং সাধারণ ব্যবস্থাপনা সার্কেল। প্রতিটি সার্কেল একজন 'কনজারভেটর অব ফরেস্ট' এর নেতৃত্বে 'চীফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট' এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। প্রতিটি সার্কেলের অধীনে 'ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার' এর নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন বন বিভাগ ছিল। এই 'ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার' এর পদমর্যাদা একজন 'ডেপুটি কনজারভেটর অব ফরেস্ট' এর সমান ছিল। একজন 'অ্যাসিসট্যান্ট কনজারভেটর অব ফরেস্ট' ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারকে সহযোগিতা করতেন। প্রতিটি বন বিভাগে রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার বা রেঞ্জ অফিসার সংশ্লিষ্ট বন বিভাগের অধীন বিভিন্ন ভৌগোলিক রেঞ্জের দায়িত্বে থাকতেন। প্রতিটি রেঞ্জের অধীনে আবার বিভিন্ন বন বিট ছিল যার দেখাশোনা করতেন একজন বিট অফিসার। 'বিট' হচ্ছে বন প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক।

১৯৭৯ সাল পর্যন্ত বন বিভাগ উপরেল্লখিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে। ১৯৭৯ সালে নতুন বন নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। বন নীতি ১৯৯৪ এর বাস্তবায়নে ১৯৯৯ সালে সর্বশেষ বন

[৬২] ফিলিপ গাইন, ২০০৫, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯২।

বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করা হয়। এসময় কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা ৭,৩৮৫ হতে ৮,৬৮১ এ উন্নীত করা হয়। বর্তমান কাঠামো অনুযায়ী প্রধান বন সংরক্ষক (সিসিএফ) বন বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সারণি ২.৪: সাংগাঠনিক কাঠামো অনুসারে বন বিভাগের মোট জনবল

ক্রমিক নং	পদবী	সংখ্যা
১	প্রধান বন সংরক্ষক (সিসিএফ)	১
২	উপ-প্রধান বন সংরক্ষক (ডিসিসিএফ)	৪
৩	বন সংরক্ষক (সিএফ)	১১
৪	সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক	৫
৫	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও/ডিসিএফ)	৬৩
৬	সাব-ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার	৭
৭	সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ)	১৩০
৮	অন্যান্য কর্মকর্তা (১ম শ্রেণী)	৩৮
৯	রেঞ্জার	৪০৩
১০	ডেপুটি রেঞ্জার	৪৫৪
১১	ফরেস্টার	১১২৯
১২	ফরেস্ট গার্ড	২০৯৮
১৩	বোটম্যান	১১১৮
১৪	মালি	১৬০৯
১৫	অন্যান্য	১৬১১
	মোট	**৮৬৮১**

সূত্র: বন বিভাগ, ঢাকা।

বর্তমানে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার লক্ষ্যে কাজের ধরন ও দায়িত্ব অনুসারে বন বিভাগকে চারটি পৃথক শাখায় বিভক্ত করা হয়। শাখা চারটি হচ্ছে বন ব্যবস্থাপনা, সামাজিক বনায়ন, পরিকল্পনা, এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। প্রতিটি শাখা একজন উপ-প্রধান বন সংরক্ষক বা ডেপুটি চীফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট এর অধীনে পরিচালিত হয়। এছাড়া সমস্ত বন বিভাগকে মোট নয়টি সার্কেলে বিভক্ত করা হয়েছে। পাঁচটি ব্যবস্থাপনা সার্কেল, তিনটি সামাজিক বনায়ন সার্কেল এবং একটি বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সার্কেল। প্রতিটি সার্কেল একজন বন সংরক্ষক বা কনজারভেটর অব ফরেস্ট এর অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। একইভাবে বন বিভাগে মোট ৪৪টি বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে যার প্রতিটির দায়িত্বে রয়েছেন একজন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা ডিএফও।

২.৫ রাজস্ব আয়:

বন বিভাগের আয়ের প্রধান উৎস ভূ-সম্পত্তি ইজারা, জলযান ও পুকুর ইজারা, জরিমানা ও দন্ড, সরকারি যানবাহনের ব্যবহার, মৎস্যü শিকার ফি, অন্যান্য সেবা ও ফিস, ভাড়া-অনাবাসিক, ভাড়া-আবাসিক, অন্যান্য ভাড়া, কাঠ ও বনজ দ্রব্যাদি, বাজেয়াপ্তকৃত দ্রব্যাদি, উদ্ভিদ, চারা ও বীজ, টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল পত্র, অব্যবহৃত দ্রব্যাদি স্ক্র্যাপ, বিবিধ অবাণিজ্যিক বিক্রয়, অতিরিক্ত প্রদত্ত টাকা আদায় ও বিবিধ রাজস্ব। আহরিত প্রধান বনজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে কাঠ, জ্বালানি কাঠ, বল্লী এবং অপ্রধান বনজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে গোলপাতা, মধু, মোম, মাছ, কাঁকড়া, ঝিনুক, ছন, বাঁশ, বেত ও মূর্তা ইত্যাদি। ২০০১-২০০২ হতে ২০০৬-২০০৭ পর্যন্ত বনজদ্রব্য বিক্রয় এবং অন্যান্য সেবার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্ব আয়ের বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সারণি ২.৫: বন বিভাগের বিভিন্ন বছরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (২০০১-২০০৭)[৬৩]

অর্থ বছর	রাজস্ব আয় (টাকা)
২০০১-২০০২	৬৮৬,১৫৮,৫০৭
২০০২-২০০৩	৭৭৫,৪১৫,৮২৭
২০০৩-২০০৪	৮৫১,৯৫৪,০৮০
২০০৪-২০০৫	৯৬৪,৩৩০,০৬৬
২০০৫-২০০৬	১,০০৪,৬৪৩,০৫৯
২০০৬-২০০৭	৬২১,৫৪০,৪৩৩

[৬৩] বনবিভাগ, ২০০৮। সার্কেল অনুযায়ী রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ জানতে পরিশিষ্ট ২ দেখুন।

বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা, বিভিন্ন দাপ্তরিক সরঞ্জামাদির ব্যয়, অবকাঠামো সংরক্ষন ও উন্নয়নসহ প্রভৃতি খরচ অর্থাৎ বার্ষিক অনুন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ নিম্নে দেয়া হলো:

সারণি ২.৬: বন বিভাগের বার্ষিক অনুন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ

সাল / কার্যালয়	২০০৫-২০০৬	২০০৬-২০০৭	২০০৭-২০০৮
সদর দপ্তর	**২৮,২৮৭,০০০**	**৪০,০৮৬,০০০**	**৫১,১৮১,০০০**
আঞ্চলিক কার্যালয়	**৮১১,২১৩,০০০**	**১,০০০,০৫৭,০০০**	**১,১৪৮,৩৭৫,০০০**
মোট	**৮৩৯,৫০০,০০০**	**১,০৪০,১৪৩,০০০**	**১,১৯৯,৫৫৬,০০০**

সূত্র: বন বিভাগ, জুলাই ২০০৮।

তৃতীয় অধ্যায়
বন বিভাগে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র

৩.১ দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন:

মূলত দেশের পরিবেশগত ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও বনাঞ্চলসমূহের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সঠিক নিয়মে বনজ সম্পদ আহরণ ও রাজস্ব আদায় বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের পরিবর্তে বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বন বিভাগে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনসমূহ নিম্নরুপ:

০১. *সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে কাঠ চুরি ও পাচারে সহযোগিতা,*
০২. *স'মিল কর্তৃক অবৈধ কাঠ ব্যবহার ও পাচারে সহযোগিতা,*
০৩. *ফার্নিচার দোকান কর্তৃক অবৈধ কাঠ ব্যবহার ও পাচারে সহযোগিতা,*
০৪. *মাত্রাতিরিক্ত বনজ সম্পদ সংগ্রহে সহযোগিতা,*
০৫. *সুন্দরবনে ডাকাত নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা,*
০৬. *বনজ সম্পদ নিলামে বিক্রির ক্ষেত্রে অনিয়ম,*
০৭. *বন মামলা দায়ের ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অনিয়ম,*
০৮. *বন বিভাগে নিয়োগ, পদায়ন বা পোস্টিং এবং বদলির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি,*
০৯. *প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে অনিয়ম,*
১০. *বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনভূমি অবৈধ দখলে সহযোগিতা,*
১১. বন নীতি ও বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন,
১২. তথ্য প্রদানে অনীহা ও অসহযোগিতা।

নিম্নে বন বিভাগে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনসমূহ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো।

৩.২ সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে কাঠ চুরি ও পাচারে সহযোগিতা

দেশের বনাঞ্চলগুলোতে দুর্নীতি ও অনিয়মের অন্যতম প্রধান ধরন হচ্ছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে অবৈধভাবে কাঠ সংগ্রহ ও পাচার। এর ফলে দেশের বনাঞ্চল একদিকে যেমন উজাড় হচ্ছে, তেমনি সরকার বঞ্চিত হচ্ছে প্রাপ্য রাজস্ব থেকে। দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে কাঠ চুরি ও পাচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অঞ্চল ভেদে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। নিম্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ এবং সুন্দরবন হতে অবৈধভাবে কাঠ চুরি ও পাচার প্রক্রিয়া আলোচনা করা হলো।

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল হতে কাঠ চুরির ইতিহাস

প্রাচীনকাল থেকেই বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় জনগণ তাদের দৈনন্দিন জ্বালানি ও অন্যান্য চাহিদা মেটানোর জন্য বনাঞ্চলের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বনাঞ্চল থেকে কাঠ সংগ্রহের ইতিহাস খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। মূলত ১৮৬২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধান নদ-নদীগুলোতে টোল স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে বন বিভাগের কার্যক্রম শুরু হলেও এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৮৬৯ সালে এই অঞ্চলে একজন সহকারী বন সংরক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে।

বন বিভাগের কার্যক্রম শুরুর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পরিকল্পিত উপায়ে বাণিজ্যিকভাবে কাঠ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি। বাণিজ্যিকভাবে কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৩২-৩৩ সালে ২৫ অশ্বশক্তির একটা ক্যাটরপিলার ট্রাকটর ক্রয় করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬০ সালে 'ফরেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন' নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে কাঠ সংগ্রহের জন্য বন বিভাগের সাথে ৩০ বছরের চুক্তি করে এবং বাণিজ্যিকভাবে কাঠ সংগ্রহ শুরু করে।

এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গৃহীত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও সামাজিক ঘটনা দ্বারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঠ সংগ্রহের ইতিহাস প্রভাবিত হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা হচ্ছে ১৯৬২ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ ও পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের উদ্বোধন। এই বাঁধ তৈরির ফলে রাঙ্গামাটির প্রায় ২৫৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা পানির নিচে ডুবে যায়। এর মধ্যে প্রায় ৫৪ হাজার একর ছিল কৃষি জমি, যা রাঙ্গামাটির মোট আবাদী জমির প্রায় ৪০ শতাংশ। এছাড়া প্রায় ১০ বর্গকিলোমিটার সংরক্ষিত বনাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যায়।[৬৪] ডুবে যাওয়া এলাকার অধিবাসীদের একাংশকে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে মাইনীমুখ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের প্রায় ২.৫ বর্গ কিমি এলাকা 'ডি রিজার্ভ' করা হয়। কাপ্তাই হ্রদ সৃষ্টির পর ১০৫.৩২ বর্গ কি.মি জায়গা ডিরিজার্ভ করা হয় কাসালং পুনর্বাসন জোন প্রতিষ্ঠার জন্য। কাপ্তাই শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠার জন্য

[৬৪] *বাংলাদেশ জেলা গেজেট ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম,* ১৯৭৫, ঢাকা।

সীতাপাহাড় রিজার্ভের ১০০ একর বা ০.০৪ বর্গ কি.মি. ডি-রিজার্ভ করা হয়। রাঙ্গামাটিতে ২৫৬ একর বা ১.০৪ বর্গ কি.মি জমির একটি সংরক্ষিত এলাকা ছিল, যা পরে সম্পূর্ণভাবে উজাড় করে রাঙ্গামাটি পুরাতন বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সাল থেকে সরকার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় ৪ লক্ষ লোককে এখানে পুনর্বাসন শুরু করে। বসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবে এই পুনর্বাসিত অভিবাসীরা বনাঞ্চল থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঠ সংগ্রহ শুরু করে এবং ধীরে ধীরে এই কাঠ ব্যবসার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে তৎকালীন স্থানীয় বিদ্রোহী শান্তিবাহিনী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানকার নিরাপত্তা বাহিনী তথ্য সংগ্রহকারীদের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে কাঠ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা দিত। এভাবেই এই অঞ্চলে ধীরে ধীরে বেসরকারিভাবে কাঠ ব্যবসার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি ঘটে।

তবে এই কাঠ ব্যবসা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে ১৯৯৭ সালে স্থানীয় বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর সাথে সরকারের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর। পূর্বে স্থানীয় বাঙালিরা শান্তিবাহিনীর ভয়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে কাঠ কেটে আনতে ভয় পেতো। অন্যদিকে শান্তিবাহিনী ও পাহাড়ী বিদ্রোহী গ্রুপগুলো এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে তাদের আশ্রয়স্থল এবং নিরাপত্তা বর্ম হিসেবে ব্যবহার করতো। কিন্তু শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর এই সকল উদ্দেশ্যের বিলুপ্তি ঘটে। তখন বাঙালিরা স্থানীয় পাহাড়ী অধিবাসীদেরকেও এই চোরাই কাঠের ব্যবসায় প্ররোচিত করে এবং তাদেরকে ব্যবসায়িক অংশীদার করে নেয়। এই অবৈধ বা চোরাই কাঠ ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে অতি আবশ্যক হিসেবে বনাঞ্চল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত বন বিভাগের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ভূমিকা রয়েছে। অবৈধ ও চোরাই কাঠ ব্যবসায়ীরা বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ম্যানেজ করেই এই ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা এবং চোরাই কাঠ ব্যবসায়ে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় দান এক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

পরবর্তীতে ২০০৪ সালের শেষ দিকে কাঠ চুরির ঘটনা প্রকাশ হয়ে যাওয়ায় এখানে বন বিভাগে ব্যাপক রদবদল হয়। রাঙ্গামাটি সার্কেলের তৎকালীন বন সংরক্ষককে বাধ্যতামূলক অবসর এবং ২৮ জন বন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাসপেন্ড করা হয়। স্থানীয় সেনাবাহিনীতেও এর প্রভাব পড়ে। বিভাগীয় তদন্তে দোষী সাব্যস্ত ৩২ জন সেনা সদস্যকে শাস্তি দেওয়া হয়। একইভাবে আনসার ও ভিডিপি থেকে ৩৫ জন আনসারকে বরখাস্ত করা হয়।[৬৫] পরবর্তীতে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত বন সংরক্ষকের সদিচ্ছা ও কর্মদক্ষতার কারণে ২০০৫ পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন রাঙ্গামাটি সার্কেল থেকে চোরাই কাঠ পাচার অনেকটা নিয়ন্ত্রণে ছিল।

কাঠ চুরির ক্ষেত্রে জোত পারমিট ও ট্রানজিট পাশের ভূমিকা

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাঠ সংগ্রহ ও পাচার করার ক্ষেত্রে জোত পারমিটকে অবৈধ ভাবে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে চোরাই কাঠ পাচারের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে একটা বৈধতার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয় অর্থাৎ ভুয়া জোত পারমিটের কাগজ তৈরি করে জোত পারমিটের আড়ালে সংরক্ষিত বনের কাঠ চুরি করা হয়। অবৈধ কাঠকে জোত পারমিটের আড়ালে বৈধ রূপ দেওয়ার জন্য অনুসরণ করা হয় একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। তেমনি ভাবে চোরাই কাঠ জেলার বাইরে পাচারের জন্য ট্রানজিট পাশ ব্যবহার করা হয়।

জোত পারমিট ও ট্রানজিট পাশ

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি বা জোতের বা বাগানের কাঠ কাটার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার বন বিভাগ থেকে কাঠ কাটার অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। মূলত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাঠ সংরক্ষণ ও অবৈধভাবে কাঠ চুরি বন্ধের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালের বন আইনের মাধ্যমে এই পূর্ব অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। কাঠ কাটার জন্য সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ থেকে গ্রহণকৃত এই পূর্ব অনুমতিকেই চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জোত পারমিট বলা হয়। অনুরূপভাবে সংগ্রহকৃত কাঠ এক জেলা হতে অন্য জেলাতে পরিবহণ করার জন্যও সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ হতে অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। জেলার বাইরে কাঠ পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় এই অনুমতিকেই 'ট্রানজিট পাশ' বা 'টিপি' বলা হয়।

জোত পারমিট ও ট্রানজিট পাশ ইস্যুর প্রক্রিয়া

জোত পারমিট গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয় একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। নিম্নে এই প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. জোত মালিক প্রথমে ডিসি অফিস থেকে জোত পারমিটের আবেদন সংক্রান্ত 'এ' ফরম সংগ্রহ করে এবং তা পূরণ করে ডিসি অফিসে জমা দেন।

২. ডিসি অফিস থেকে কানুনগো এবং ইউএনও বা তার কোনো প্রতিনিধি পূরণকৃত 'এ' ফরম অনুসারে নির্দিষ্ট জোতের দলিল ও ছবি পরীক্ষা করবেন এবং নির্দিষ্ট জমি পরিদর্শন করবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জোতের কারবারি ও হেডম্যান সহায়তা করেন। অনেক সময় জোত পরিদর্শনে সেনাবাহিনী ও বন বিভাগের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন।

৩. ডিসি অফিস 'এ' ফরম পাশ করে তা বন বিভাগে পাঠিয়ে দেয়।

---

[৬৫] *দৈনিক সংবাদ*, ১৫ জানুয়ারি ২০০৫।

৪. ডিএফও'র নির্দেশে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ কর্মকর্তা 'এ' ফরম অনুসারে নির্দিষ্ট জোতে যেয়ে, প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট গাছের অবস্থান ও সংখ্যা চিহ্নিত করেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি গাছে ২.৫ ফুট বেড় উচ্চতায় বন বিভাগের সিল ও নম্বর দিয়ে আসেন, যাকে বন বিভাগের পরিভাষায় 'খাড়া মার্কিং' বলা হয়। খাড়া মার্কিং করার পর রেঞ্জ কর্মকর্তা নির্দিষ্ট ফরমে চিহ্নিত গাছের তালিকা লিপিবদ্ধ করেন।

৫. রেঞ্জ কর্মকর্তা খাড়া মার্কিং করার পর সংশ্লিষ্ট বন বিভাগের এসিএফ ৫০% এবং ডিএফও ২৫% গাছের মার্কিং পুনরায় পরীক্ষা করেন।

৬. সংশ্লিষ্ট বন বিভাগের ডিএফও 'বি' ফরম ইস্যু করে অর্থাৎ গাছ কাটার অনুমতি প্রদান করেন।

৭. সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা বা রেঞ্জ অফিসারের তত্ত্বাবধানে গাছ কাটার সময় তার স্থির চিত্র ও চলচ্চিত্র ধারণ করা হয়।

৮. সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা বা রেঞ্জ অফিসারের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি কর্তনকৃত গাছ নির্দিষ্ট মাপে নির্দিষ্ট সংখ্যক খণ্ডে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি খণ্ডে বন বিভাগের সিল ও নম্বর দেওয়া হয়। এরপর রেঞ্জ কর্মকর্তা সাইজ লিস্ট তৈরি করে তা বিভাগীয় কার্যালয়ে জমা দেন।

৯. সংশ্লিষ্ট এসিএফ পুনরায় নির্দিষ্ট জোতে যেয়ে সাইজ লিস্ট ও মার্কিং পরীক্ষা করে চিহ্নিত গাছ কাটা হয়েছে তা নিশ্চিত করেন।

১০. এরপর জোত মালিক সংশ্লিষ্ট বন বিভাগে কাঠ পরিবহণের বিবরণ লিপিবদ্ধের উদ্দেশ্যে 'ডি' (Destination) ফরমের জন্য আবেদন করেন।

১১. নিজ জেলার বাইরে কাঠ পরিবহণের জন্য পুনরায় 'টিপি' বা 'ট্রানজিট পাশ' প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে রেঞ্জ কর্মকর্তা ও এসিএফ কাঠের স্টক পরীক্ষা করেন।

১২. এসিএফের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ডিএফও টিপি ইস্যু করার অনুমতি দেন।

১৩. অনুমতি পাওয়ার পর ডেপুটি রেঞ্জার ও ফরেস্ট গার্ডের উপস্থিতিতে ট্রাক লোড করা হয়।

১৪. এসিএফ পুনরায় কাঠভর্তি ট্রাক পরীক্ষা করে টিপি ইস্যু করেন।

সম্ভাব্য পরিমাণ অর্থাৎ প্রতিমাসে সম্ভাব্য ইস্যুকৃত জোত পারমিটের সংখ্যা

সঠিকভাবে যথাযথ তদন্তের পর জোত পারমিট ইস্যুর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে প্রতি জোত পারমিট ইস্যুতে গড়ে চার মাসের বেশি সময় প্রয়োজন হয়। সংশ্লিষ্ট জোতের বা বাগানের অবস্থান কোন দুর্গম স্থানে হলে সেক্ষেত্রে আরও বেশি সময় প্রয়োজন হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বন বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ও তাদের অন্যান্য কর্মকান্ডে ব্যস্ততাও এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন বন বিভাগে বিদ্যমান কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা, বিভিন্ন জোতের দূরত্ব এবং এক্ষেত্রে অনুসরণীয় দীর্ঘ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসরণ করলে বিভিন্ন বন বিভাগের পক্ষে মাসে ৬-১০টির অধিক জোত পারমিট ইস্যু করা সম্ভব নয়। এই হিসেবে রাঙামাটি সার্কেলে মোট ছয়টি বন বিভাগ হতে প্রতি মাসে ৩৬-৬০টির অধিক জোত পারমিট ইস্যু করা সম্ভব নয়।

বন আইন অনুযায়ী জোত পারমিট প্রদানের ক্ষেত্রে সংখ্যাগত কোন সীমাবদ্ধতা বা বিধিনিষেধ না থাকলেও অধিক পরিমাণে ও অবৈধ জোত পারমিট প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রধান বন সংরক্ষক কর্তৃক ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে প্রেরিত নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে প্রতি মাসে অনূর্ধ্ব ১০০টি জোত পারমিট প্রদানের এবং প্রতি জোত পারমিটে অনূর্ধ্ব ১০০০ (এক হাজার) সি.এফ.টি কাঠ আহরণের অনুমতি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এই নির্দেশের বিরুদ্ধে কাঠ ব্যবসায়ীদের দায়েরকৃত মামলার কারণে পরে ২০০৪ সালে এই নির্দেশটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

সারণি ৩.১: রাঙ্গামাটি সার্কেলে বিভিন্ন বছরে ইস্যুকৃত জোত পারমিটের সংখ্যার তুলনা

আর্থিক সন	জোত পারমিটের সংখ্যা	কাঠের পরিমাণ (ঘনফুট)	জ্বালানি কাঠ (ঘনফুট)	জোত পারমিট প্রতি কাঠের গড় পরিমাণ	ট্রাক সংখ্যা (প্রতি ট্রাক ৪০০ ঘনফুট)
২০০৩-০৪	১,২৮৪	১৭,৯৫,১৪৬	৮,৫৭,০৩০	১,৩৯৮	৪,৪৮৮
২০০৪-০৫	১,৫৭৬	১৯,৬৮,২২৪	৩,১৮,৬০০	১,২৪৯	৪,৯২১
২০০৫-০৬	৫৫	৮৫,৫৮৯	২৬,২১৬	১,৫৫৬	২১৪

সূত্র: রাঙ্গামাটি সার্কেল, ২০০৭

এই নির্দেশ জারি থাকা অবস্থায়ও রাঙ্গামাটি সার্কেলে ২০০৪ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে যথাক্রমে ৬২৭টি ও ৪৮১টি জোত পারমিট ইস্যু করা হয়, যা যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করা হলে কোনভাবেই সম্ভব নয়। পরবর্তীতে এই সকল জোত পারমিটের আড়ালে বিপুল পরিমাণ চোরাই কাঠ পাচারের ঘটনা ধরা পড়ে।

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান অঞ্চলে কাঠ চুরি ও পাচারের প্রক্রিয়া

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এলাকার সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাঠ সংগ্রহ ও পাচার করার একটি অভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। অসৎ কাঠ ব্যবসায়ী ও কাঠ পাচারকারীরা কিছু দুর্নীতিবাজ বন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তায় কাঠ পাচারের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে একটা বৈধতার রূপ দেওয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ ভুয়া জোত পারমিটের কাগজ তৈরি করে জোত পারমিটের আড়ালে সংরক্ষিত বনের কাঠ পাচার করে থাকে। তবে কোনো ধরনের কাগজপত্র ছাড়াই কাঠ পাচারের ঘটনাও ব্যতিক্রম নয়।

অবৈধ কাঠকে জোত পারমিটের আড়ালে বৈধ রূপ দেওয়ার জন্য অনুসরণ করা হয় একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এ উদ্দেশ্যে প্রথমে স্থানীয় জোতের মালিকের কাছ থেকে জমির দলিল ও ছবি নিয়ে জোত পারমিটের জন্য আবেদন করা হয়। আর এজন্য ঐ জোত মালিকের সাথে ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে চুক্তি করতে হয়। নির্দিষ্ট জোতের দলিলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কারবারী ও হেডম্যান কর্তৃক সত্যায়িত করার জন্য তাদেরকে যথাক্রমে ৫,০০০ ও ১০,০০০ টাকা দিতে হয়। ডিসি অফিস ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট জোতে যেয়ে দলিল ও অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে জোত পারমিট ইস্যু করার কথা থাকলেও সাধারণত তা করা হয় না। পারমিট প্রতি গড়ে প্রায় ১২ হাজার টাকা ডিসি অফিসে এবং গড়ে ৪০ হাজার টাকা বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে কোনো তদন্ত ছাড়াই জোত পারমিট ইস্যু করিয়ে নেওয়া হয়।

অন্যদিকে ১০-১৫ জনের একদল কাঠ কাটার শ্রমিক, যাদেরকে স্থানীয় ভাষায় করাতী বলা হয়, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ১০-১৫ দিনের জন্য সংরক্ষিত বনে যেয়ে কাঠ কেটে নির্দিষ্ট স্থানে জমা করে রাখে। এক্ষেত্রে সংরক্ষিত বনের সংশ্লিষ্ট বনরক্ষীকে ১,৫০০ সিএফটি কাঠের জন্য গড়ে ১৫ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। পরে পাহাড়ী ধোলাই শ্রমিক ও লোড শ্রমিকের সহায়তায় ঐ সকল কাঠ নদী পথে ট্রলার বা নৌকায় করে অথবা চালি করে বা ভুর সাজিয়ে শহরে নিয়ে আসা হয়। পথিমধ্যে পাহাড়ী সংগঠন জেএসএস ও ইউপিডিএফ উভয় পক্ষকেই গড়ে ৫ হাজার টাকা করে চাঁদা দিতে হয়। এছাড়া নদীপথে কাঠ পরিবহণের সময় বন বিভাগের ২/৩টি চেকপোস্ট অতিক্রম করতে হয়, যার প্রত্যেকটিতে গড়ে প্রায় ২ হাজার টাকা করে ঘুষ দিতে হয়।

এভাবে চোরাই কাঠ শহরে নিয়ে আসার পর এই কাঠের কিছু অংশ স'মিলে চেরাই করার জন্য পাঠানো হয়। অন্যদিকে বাকি কাঠ গোল ও রদ্দা হিসেবে পাচারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। শহর হতে কাঠ পাচারের পূর্বে পুনরায় ডিসি অফিস (এলআরফান্ড), স্থানীয় থানা, প্রেসক্লাব, সরকারি দল, বিরোধী দল, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা প্রত্যেককে নির্দিষ্ট হারে চাঁদা দিতে হয়। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান থেকে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় কাঠ পরিবহনের জন্য বন বিভাগ থেকে টিপি নিতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতি টিপি অর্থাৎ প্রতি ট্রাক কাঠের জন্য বন বিভাগকে গড়ে প্রায় ১২ হাজার টাকা করে ঘুষ দিতে হয়। এছাড়াও পথে বন বিভাগের প্রতিটি চেকপোস্টে এবং বিডিআর ও টহল পুলিশকেও ঘুষ দিতে হয়। জোত পারমিটের কাগজপত্র ছাড়া চোরাই কাঠ পাচার করার ক্ষেত্রে প্রতি স্থানে নিয়মিত হারের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ঘুষ দিতে হয়। কখনো কখনো পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী কাঠ ভর্তি ট্রাকের নম্বর সকল চেকপোস্টে জানিয়ে দেওয়া হয়, ফলে পথে কোনো রকম হয়রানির শিকার হতে হয় না।

সংরক্ষিত বনাঞ্চলের চোরাই কাঠ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তিমালিকানাধীন জোতের কাঠ বিক্রির ক্ষেত্রেও জোত মালিককে বন বিভাগের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানির শিকার হতে হয়। এক্ষেত্রেও জোত পারমিট ইস্যুর প্রক্রিয়ায় ডিসি অফিস ও বন অফিসের কিছু অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারী অবৈধ লেনদেনের সাথে জড়িত। বর্তমান নিয়মানুযায়ী একটি জোত পারমিট ইস্যুর পূর্বে নির্দিষ্ট জোতে কমপক্ষে ছয় (৬) বার বন বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তদন্ত বা পরিদর্শন করতে হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবার পরিদর্শনের জন্য যাতায়াত, হাত খরচ ও ঘুষ বাবদ বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য গড়ে ৮-১০ হাজার টাকা খরচ করতে হয়। অনুরূপভাবে কানুনগো ও ইউএনওকেও দলিল পরীক্ষা ও জোত পরিদর্শনের জন্য গড়ে ৫-৬ হাজার টাকা দিতে হয়।

শহরের বাইরে কাঠ পরিবহণের ক্ষেত্রেও প্রতিটি চেকপোস্টে গড়ে ২-৩ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। উল্লেখ্য, রাঙ্গামাটি থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার সময় বন বিভাগের মোট ৫টি চেকপোস্ট এবং চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাওয়ার সময় বন বিভাগের ৬টি চেকপোস্ট রয়েছে। অর্থাৎ রাঙ্গামাটি থেকে ঢাকা যাওয়ার সময় একটি ট্রাককে বন বিভাগের মোট ১১টি চেকপোস্ট পার হতে হয়। অনুরূপভাবে খাগড়াছড়ি থেকে করেরহাট হয়ে ঢাকা যাওয়ার সময় বন বিভাগের মোট আটটি চেকপোস্ট এবং খাগড়াছড়ি থেকে চট্টগ্রাম হয়ে ঢাকা যাওয়ার সময় মোট ১০টি চেকপোস্ট পার হতে হয়। এছাড়া পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট রয়েছে। সেনাবাহিনী ছাড়া অন্য সকল চেকপোস্টেই ট্রাকপ্রতি গড়ে প্রায় দুই হাজার টাকা করে ঘুষ দিতে হয়।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, একটি জোত পারমিটের আড়ালে সংরক্ষিত বন হতে গড়ে ১৫০০ সিএফটি কাঠ রাঙ্গামাটি শহরে পাচার করতে বন বিভাগ ও ডিসি অফিসসহ মোট ১৪ টি খাতে গড়ে প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা ঘুষ বা চাঁদা প্রদান করতে হয়। এই কাঠ ভর্তি ট্রাক রাঙ্গামাটি হতে চট্টগ্রাম শহরে পাচার করার ক্ষেত্রে পুনরায় বন বিভাগের বিভিন্ন চেকপোস্টসহ মোট ১৩ টি খাতে ট্রাক প্রতি গড়ে প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকা ঘুষ বা চাঁদা দিতে হয়। অর্থাৎ গড়ে ৪০০ সিএফটি বা এক ট্রাক কাঠ এই অঞ্চলের সংরক্ষিত বন থেকে চট্টগ্রাম শহরে পাচার করতে প্রায় ২৭ টি খাতে গড়ে প্রায় ৮৪ হাজার টাকা ঘুষ বা চাঁদা দিতে হয়। এই কাঠ ঢাকা শহরে পাচার করার জন্য অতিরিক্ত আরও প্রায় ৫০ হাজার টাকা ঘুষ বা চাঁদা দিতে হয়। এই এক ট্রাক কাঠের বাজারমূল্য প্রায় ৮ লক্ষ টাকা।

চিত্র ৩.১: পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙ্গামাটি) এলাকায় কাঠ পাচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে অবৈধ অর্থ প্রদান

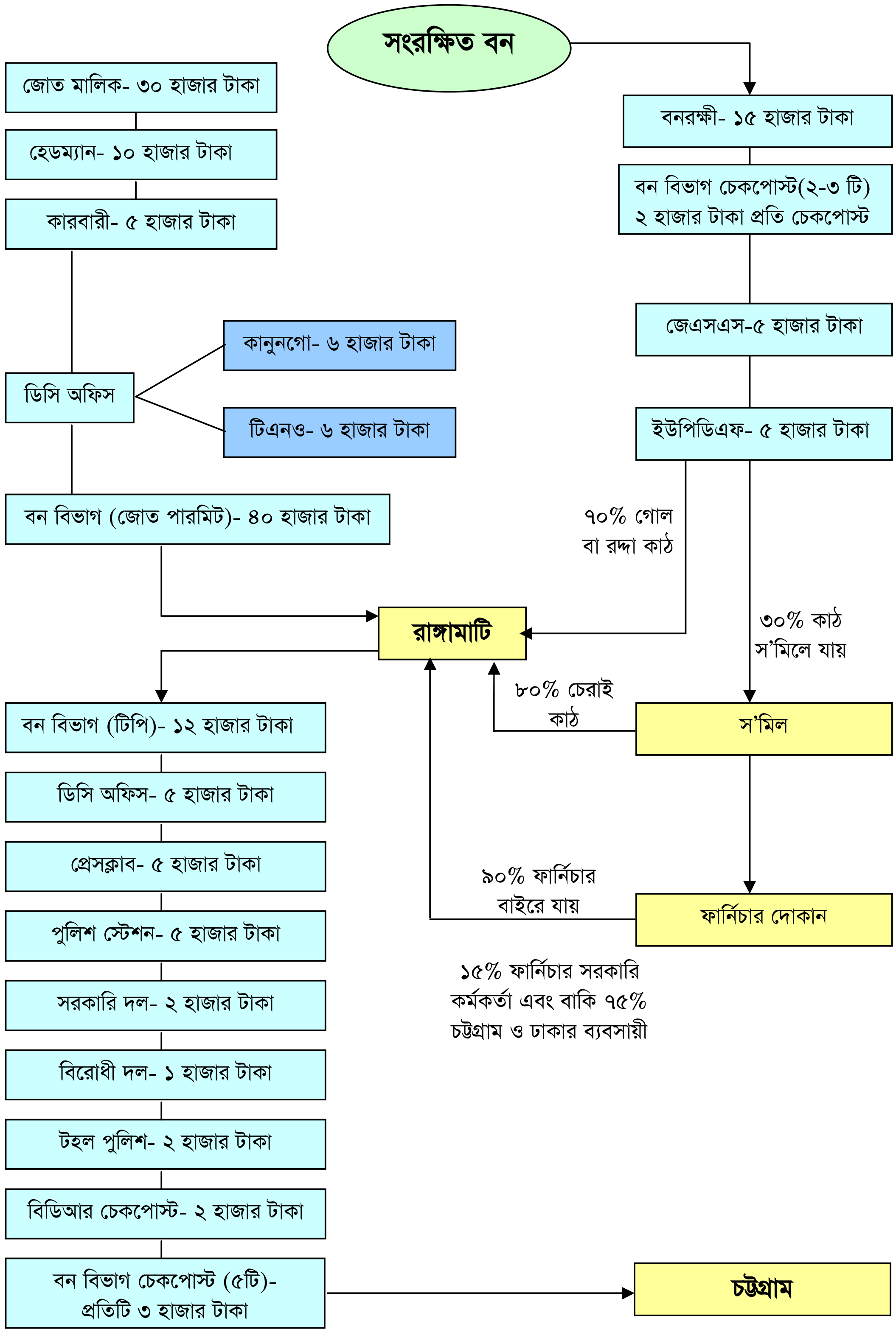

রাঙ্গামাটি হতে ২০০৫ এর পূর্বে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০ ট্রাক কাঠ পাচার করা হতো। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ২-৩ ট্রাক কাঠ শহরের বাইরে যায়। অনুরূপভাবে খাগড়াছড়ি থেকে ২০০১ এর আগে প্রতিদিন গড়ে ২০ ট্রাক কাঠ পাচার হতো। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট কড়াকড়ি আরোপ করায় ২০০৪ পর্যন্ত দিনে ১০ ট্রাকের বেশি কাঠ পাচার হতো না। বর্তমানে মাসে গড়ে ১০ ট্রাক কাঠ পাচার হয়। যেখানে ২০০৫ এর আগে বান্দরবান শহর থেকে মাসে গড়ে ৫০০ কাঠ ভর্তি ট্রাক পাচার হতো, সেখানে বর্তমানে (২০০৬-০৭) মাসে গড়ে ৩০ ট্রাক কাঠ পাচার হয়।

সারণি ৩.২: পাচারকৃত কাঠ ভর্তি ট্রাকের সংখ্যা

এলাকার নাম	২০০৫ সনের পূর্বে প্রতি মাসে ট্রাক সংখ্যা	বর্তমানে (২০০৬-০৭) প্রতি মাসে ট্রাক সংখ্যা
রাঙ্গামাটি	৬০০	৫০
খাগড়াছড়ি	৬০০	১০
বান্দরবান	৫০০	৩০

মূলত সংরক্ষিত বনাঞ্চল বর্তমানে বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়ায় পূর্বের মতো কাঠ সংগ্রহ ও পাচার সম্ভব হয় না। তবে ২০০৪ সালের শেষে ব্যাপক পরিমাণে কাঠ পাচারের ঘটনা উদঘাটিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর দুর্নীতিবাজ সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে অবৈধভাবে কাঠ পাচার প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সেনাবাহিনী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। বিশেষ করে রাঙ্গামাটি সার্কেলের তৎকালীন বন সংরক্ষকের কর্মদক্ষতা ও সততা কাঠ পাচার রোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের ফলেও কাঠ পাচার হ্রাস পেয়েছে। তবে কাঠ পাচারের পরিমাণ হ্রাস পেলেও কাঠ পাচারে বিভিন্ন স্থানে বন বিভাগের চাঁদা বা ঘুষের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাপ্তাই অঞ্চলের কাঠ পাচারের রুট

রাঙ্গামাটি সার্কেলে কাপ্তাই এলাকায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে কাঠ চুরি ও পাচারের ক্ষেত্রে পাচারকারীদের ব্যবহৃত কিছু রাস্তার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

রুট নং-১: কাপ্তাই খাল দিয়ে চালি বা রদ্দা আকারে পানির ১/২ ফুট নিচ দিয়ে কাঠ পাচার করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে আলিক্ষ্যিং ও ফারুয়া হয়ে বল্লীপাড়া-রাজস্থলী-কাপ্তাই খাল মুখ পার হয়ে কর্ণফুলী নদী পথে কোদালা হয়ে চট্টগ্রামে কাঠ পাচার করা হয়।

রুট নং-২: নারানগিরি খালের মাধ্যমে কাঠ পাচারের ক্ষেত্রে মৌসুমভেদে পাচারের রাস্তা ও পদ্ধতির কিছুটা ব্যতিক্রম হয়।

(১) বর্ষার সময় অর্থাৎ লেকে পানি থাকলে চালি আকারে রাজস্থলী বেইলি ব্রিজের নিচ দিয়ে তিনছড়ি ভালুকিয়া-কালামাইস্যা-বালামছড়ি-হাফছড়ি-নারানগিরি-রাইখালী-বাঙ্গালহালিয়া সড়কের প্রায় ২০টি পয়েন্টে সড়ক পার হয়ে কোদালা দিয়ে কাঠ পাচার হয়ে থাকে।

(২) শুষ্ক মৌসুমে রাজস্থলী বেইলি ব্রিজের নিচ দিয়ে কাঁধে করে পায়ে হেঁটে কিছুদুর আসার পর নারানগিরি খালের পাশের রাস্তা দিয়ে তিনছড়ি-ভালুকিয়া-কালামাইস্যা-বালামছড়ি-হাফছড়ি হয়ে নারানগিরি সড়কের প্রায় ২০টি পয়েন্টে সড়ক পার হয়ে কোদালা দিয়ে কাঠ পাচার হয়ে থাকে।

রুট নং-৩: নারানগিরি খাল ও পাশের রাস্তায় আগত কাঠ রাইখালী-বাঙ্গালহালিয়া ১৩ কি.মি. সড়কের প্রায় ২০টি পয়েন্টে সড়ক পার হয়ে কোদালায় যায়। এই ২০টি পয়েন্টের মধ্যে বাঙ্গালহালিয়া বাজারের দক্ষিণ এলাকা, ছেলমারা, হাতিমারা, বালুখালী, কারিগরপাড়া, রাইখালী রেঞ্জ অফিসের পাশ দিয়ে মৌতিপাড়া, সন্দীপপাড়া, ফুলতলি মোহাম্মদপুর, রিফুজিপাড়া, রাইখালী ডিপো ইত্যাদি পয়েন্টগুলি অন্যতম।

রুট নং-৪: কোদালা স্কুল ঘাট, ব্রিকফিল্ড ঘাট, কোদালা বাজার ঘাট ও কাইউম চেয়ারম্যানের ঘাট থেকে বোটে লোড হয়ে চিরিঙ্গা ফরেস্ট চেক ষ্টেশন পার হয়ে চট্টগ্রাম এবং কিছু কিছু বোট কর্ণফুলী নদী পার হয়ে চন্দ্রঘোনা-চট্টগ্রাম সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বে সুইগোটা, কালুগোটা, মোল্লাপাড়া, বুইজ্যার দোকান, হাসেম খাল, চারাবটল, মরিয়ম নগর প্রভৃতি এলাকায় পিকআপ বা মাইক্রোবাস ইত্যাদিতে লোড হয়ে মোহরা চেক স্টেশন হয়ে চট্টগ্রামে পাচার হয়।

রুট নং-৫: নারানগিরি ও ডুলুছড়ি এলাকার কাঠ সুযোগ মত ছোট ছোট নৌকায় কর্ণফুলী নদী পার হয়ে বড়ইছড়ি চেক স্টেশন এলাকায় পিকআপ বা মাইক্রোবাসে লোড হয়, কিছু কাঠ কেপিএম ঘাট, মিশন ঘাট, আমতলী ঘাটে

আসে ও দোভাসী বাজার বা লিচু বাগান বাজারের ফার্নিচারের দোকানে ব্যবহৃত হয় ও সুযোগ মত মাইক্রোবাসে ও পাবলিক বাসে লোড হয়ে চট্টগ্রাম যায়।

রুট নং-৬: আড়াছড়ি এলাকার কাঠ রাইখালি-বাঙ্গালহালিয়া সড়কের ফুলতলি, সন্দীপাড়া, মোহাম্মদপুর, রিফুজিপাড়া, রাইখালী ডিপো এলাকা দিয়ে সড়ক পার হয়ে কোদালায় পাচার হয়। কিছু কাঠ নারানগিরি ও ডুলুছড়ি আসে। অতপর এলাকার কাঠ সুযোগ মত ছোট নৌকায় কর্ণফুলী নদী পার হয়ে বড়ইছড়ি চেক স্টেশন এলাকায় পিকআপ বা মাইক্রোবাসে লোড হয়। কিছু কাঠ কেপিএম ঘাট, মিশন ঘাট, আমতলী ঘাটে আসে ও দোভাষী বাজার বা লিচু বাগান বাজারের ফার্নিচারের দোকানে ব্যবহৃত হয় ও সুযোগ মত মাইক্রোবাসে ও পাবলিক বাসে লোড হয়ে চট্টগ্রাম যায়।

এছাড়া রাঙ্গামাটির অধিকাংশ কাঠ নদীপথে শুভলং থেকে রাঙ্গামাটি শহরে এনে জমা করা হয়। পরে শহর থেকে ট্রাকে করে বেতবুনিয়া গুদারপাড় ও হাটহাজারী হয়ে চট্টগ্রাম পাঠানো হয়। একইভাবে কিছু কাঠ খাগড়াছড়ি শহর হয়ে পাচার করা হয়। এক্ষেত্রে বাঘাইহাট ও জামতলী হয়ে খাগড়াছড়ি শহরে কাঠ জমা করা হয়। পরে ট্রাকে করে কাঠ জালিয়াপাড়া, রামগড়, করেরহাট, ধুমঘাট পার করে সোয়াগাজী ও সোনারগাঁও হয়ে ঢাকাতে পাচার করা হয়।

লামা, আলীকদম, নাইক্ষংছড়ি ও চকরিয়া অঞ্চল হতে কাঠ চুরি ও পাচার প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ বনাঞ্চল হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের লামা আলীকদম ও নাইক্ষংছড়ি। দেশের অন্যান্য বনাঞ্চলের মতো এখানেও অবৈধ কাঠ ব্যবসায়ীরা বন বিভাগের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সহায়তায় প্রতিনিয়ত এই অঞ্চলের কাঠ পাচার করছে। এই অঞ্চলসমূহের কাঠ ব্যবসার পুঁজির মূল যোগানদাতা চট্টগ্রাম অঞ্চলের কাঠ ব্যবসায়ীরা। কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী চকরিয়া ও নাইক্ষংছড়িতে নিজস্ব পুঁজিতে ব্যবসা করলেও অধিকাংশ ব্যবসায়ী চট্টগ্রামের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দাদন বা পুঁজি ধার নিয়ে এই ব্যবসা করে থাকে। চকরিয়ার এই সকল কাঠ ব্যবসায়ী পুনরায় লামা, আলীকদম ও নাইক্ষংছড়িতে বিভিন্ন চোরাই দলের সর্দারকে দাদন দিয়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে কাঠ চুরি করে আনতে পাঠায়। পরে এই চোরাই কাঠ চকরিয়া থেকে চট্টগ্রাম শহর ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পাচার হয়ে যায়।

প্রবাহচিত্র ৩.২: আলী কদম, লামা ও নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে চকরিয়ায় কাঠ পাচার

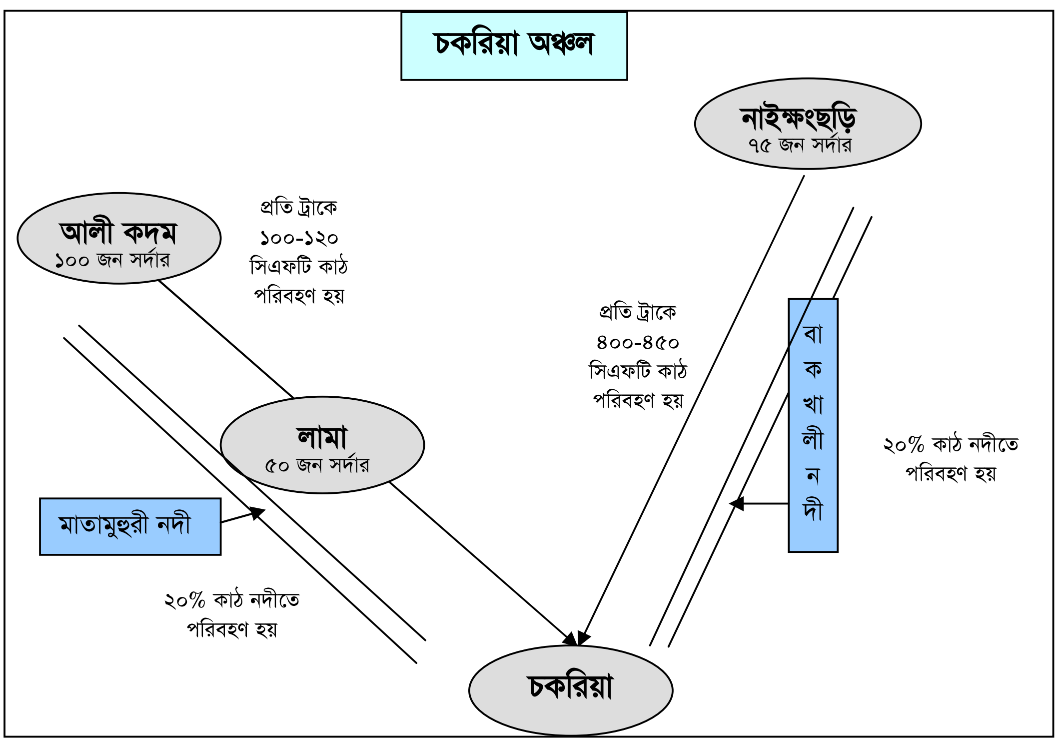

এই অঞ্চলসমূহের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরিমাণে বেশি কাঠ (৪০%) আলীকদম থেকে সংগ্রহ করা হয়। লামা ও নাইক্ষংছড়ি থেকে প্রায় সমান কাঠ সংগ্রহ করা হয়। আলীকদমে কাঠ চুরির সাথে জড়িত প্রায় ১০০টি চোরাই দল, প্রত্যেক দলে প্রায় ১৫-২০ জন সদস্য আছে। অনুরূপভাবে, লামাতে কাঠ চুরির সাথে জড়িত দল আছে প্রায় ৫০টি এবং নাইক্ষংছড়িতে আছে প্রায় ৭০টি দল। এই সকল চোরাই দল মূলত রাত্রে সংরক্ষিত বনে যেয়ে গাছ কাটে। এই গাছ পরে খন্ড খন্ড করে ধোলাই শ্রমিকের সাহায্যে

পাহাড় থেকে নিচে কোন গোপনীয় স্থানে লুকিয়ে রাখা হয়। পরে সুবিধামতো সময়ে এই গোপনীয় স্থান থেকে ট্রলি বা ছোট ট্রাকের মাধ্যমে চোরাই কাঠ চকরিয়াতে নিয়ে আসা হয়। লামা ও আলীকদম থেকে চকরিয়া পর্যন্ত সড়ক পথ উচুঁ নিচু হওয়ায় এখানে প্রতি ট্রাকে গড়ে ১০০-১২০ সিএফটির বেশি কাঠ পরিবহণ করা সম্ভব হয় না। তবে নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে বড় ট্রাকে করে গড়ে ৪০০ সিএফটি কাঠ নিয়ে আসা হয়। এছাড়া বর্ষা মৌসুমে লামা ও আলীকদম থেকে কিছু চোরাই কাঠ স্থানীয় মাতামুহুরী নদীতে ছোট নৌকা ও কলাগাছের ভেলার নিচে বেঁধে চকরিয়া কাছাকাছি স্থানে নিয়ে আসা হয়। শুধুমাত্র বর্ষা মৌসুমেই নদীতে কাঠ পরিবহণ সম্ভব। অনুরূপভাবে নাইক্ষ্যংছড়ি থেকে বাকখালি নদীতে একইভাবে কিছু চোরাই কাঠ চকরিয়ায় নিয়ে আসা হয়।

দেশের অন্যান্য বনাঞ্চলের মতো এই অঞ্চলেও বনজ সম্পদ উজাড়ে বন বিভাগের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কমকর্তা-কর্মচারী জড়িত। মূলত জোত পারমিটের আড়ালেই এখানকার সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বনজ সম্পদ উজাড় হচ্ছে। অবৈধ অর্থের বিনিময়ে বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সহায়তায় নির্দিষ্ট নিয়ম ও তদন্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই জোত পারমিট ইস্যু করা হয়। অন্যদিকে চোরাই দল সংরক্ষিত বন থেকে কাঠ চুরি করে নিয়ে আসে। পরে জোত পারমিটের বিপরীতে বন বিভাগ থেকে টিপি ইস্যু করা হয়। এভাবেই জোত পারমিটের আড়ালেই কাঠ পাচার হয়ে যায়।

বর্তমানে প্রায় সকল কাঠই জোত পারমিটের আড়ালে পাচার হলেও ২০০৫ পূর্ববর্তী সময়ে কোন ধরনের কাগজপত্র ছাড়াই কাঠ পাচারও ব্যতিক্রম ছিল না। পরবর্তীতে সেনাসদস্যদের তৎপরতার কারণে মূলত কাগজবিহীন কাঠ পাচার বন্ধ হয়ে যায়। অবৈধ জোত পারমিট ইস্যুর ক্ষেত্রে এখানেও রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের প্রচলিত নিয়ম ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঘুষের পরিমাণও প্রায় একই। এখানেও জোত মালিককে প্রায় ৩০ হাজার টাকা দিয়ে জমির দলিলের কপি সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ডিসি অফিস ও বন বিভাগকে প্রায় ৪০ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে জোত পারমিট ইস্যু করা হয়। আলীকদম ও লামা থেকে চকরিয়া কাঠ পরিবহণে যথাক্রমে ৩ ও ২টি চেকপোস্ট পার হতে হয়। পুনরায় কাঠ চকরিয়া থেকে চট্টগ্রাম পাচারের সময় টিপি গ্রহণের জন্য বন বিভাগকে ট্রাক প্রতি ৫,০০০ টাকা করে ঘুষ দিতে হয়। অন্যান্য অঞ্চলের মতই ডিসি অফিস ও পুলিশ স্টেশনেও টাকা দিতে হয়। (সারণি ৩.৩ দ্রষ্টব্য)

সারণি ৩.৩: কাঠ পাচারের ক্ষেত্রে অবৈধ অর্থের লেনদেন

ক্রমিক নং	অবৈধ অর্থ গ্রহীতার নাম	অবৈধ অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১	জোত মালিক	৩০,০০০
২	হেডম্যান	৫,০০০
৩	কারবারী	৫,০০০
৪	বন রক্ষী	১০,০০০
৫	ডিসি অফিস (কানুন গো, টিএনও)	১২,০০০
৬	বন বিভাগ (জোত পারমিটের জন্য)	৪০,০০০
৭	জেএসএস	৫,০০০
৮	ইউপিডিএফ	৫,০০০
৯	বন বিভাগের চেকপোস্ট (প্রতিটি)	২,০০০
১০	বন বিভাগ (টি.পি.)	৫,০০০
১১	সাংবাদিক সমিতি (ট্রাক প্রতি)	৫০০
১২	পুলিশ স্টেশন	৫,০০০
১৩	ডিবি ও এনএসআই	৫,০০০

মৌলভীবাজার অঞ্চল হতে কাঠ পাচার প্রক্রিয়া:

মৌলভীবাজারে বন বিভাগ থেকে কাঠ ব্যবসার লাইসেন্স আছে মোট ১৫০ জন ব্যবসায়ীর। এছাড়া প্রায় ২,০০০ জন অবৈধ বা চোরাই কাঠ ব্যবসায়ী আছে, যাদেরকে স্থানীয় ভাষায় 'ফ্লাইং ব্যবসায়ী' বলে। দেশের অন্যান্য বনাঞ্চলের মতো মৌলভীবাজারেও ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গায় কাঠ কাটার জন্য বন বিভাগ থেকে পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। এই পূর্ব অনুমতি গ্রহণকেই পার্বত্য অঞ্চলে 'জোত পারমিট' এবং মৌলভীবাজারে 'হোম পারমিট' বলে। মৌলভীবাজারে প্রতি হোম পারমিটের বিপরীতে গড়ে অনূর্ধ্ব ৩০০ ঘনফুট কাঠ সংগ্রহ বা কাটার অনুমতি দেওয়া হয়।

হোম পারমিট গ্রহণের প্রক্রিয়া পার্বত্য অঞ্চলের জোত পারমিট প্রদান প্রক্রিয়ার মতোই দীর্ঘ ও অস্বচ্ছ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই হোম পারমিট ইস্যু করতে এক বছর পর্যন্ত সময় লাগে। অন্যদিকে হোম পারমিট প্রতি বন বিভাগকে ১২-১৫ হাজার টাকা

ঘুষ দিতে হয়। হোম পারমিট নিয়ে গাছ কাটার পর তা পরিবহণের উদ্দেশ্যে টিপি গ্রহণ ও বিভিন্ন চেকপোস্ট পার হওয়ার জন্য পুনরায় বন বিভাগকে ঘুষ দিতে হয়। এই সকল হয়রানি এড়ানোর উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকেরা যারা অল্প পরিমাণে গাছ কাটে তারা হোম পারমিট না নিয়েই গাছ কাটে এবং গোপনে বাজারে নিয়ে কাঠ ব্যবসায়ীদের কাছে অথবা স'মিল মালিকের কাছে বিক্রি করে দেয়। তবে এক্ষেত্রে তারা গাছের মূল্য অনেক কম পায়।

প্রবাহচিত্র ৩.৩: মৌলভীবাজার হতে কাঠ পাচারের ক্ষেত্রে অবৈধ অর্থ প্রদান

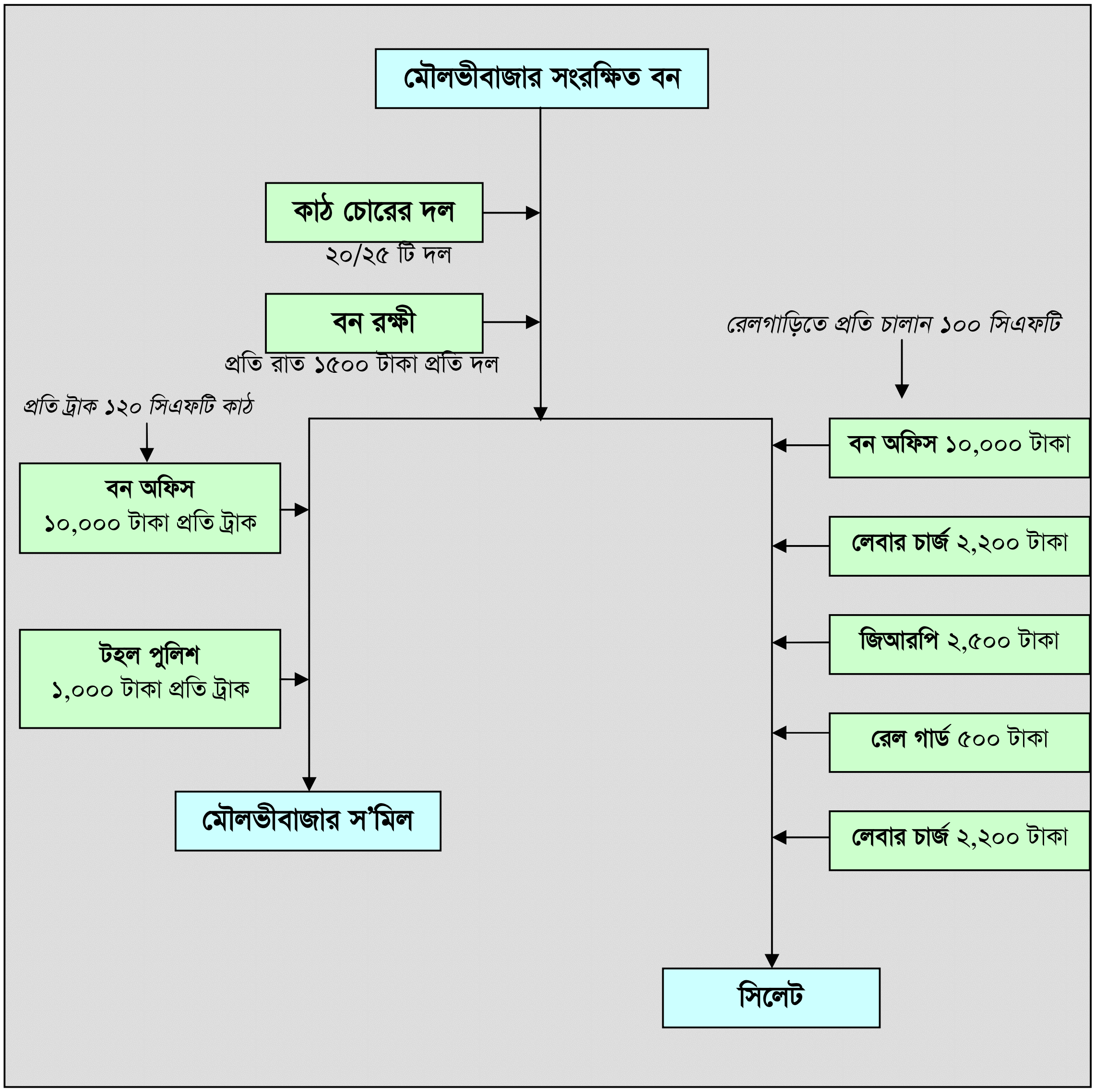

মৌলভীবাজারে বাণিজ্যিকভাবে যে কাঠের ব্যবহার হয় তার প্রায় ৭০% চোরাই কাঠ। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১,০০০ সিএফটি কাঠ চুরি হয় বলে অভিযোগ আছে। সংঘবদ্ধ একটি চক্র এই কাঠ চুরির সাথে জড়িত। মৌলভীবাজারে প্রায় ২০-২৫টি কাঠ চুরির দল আছে। প্রতি দলে ১০-১২ জন সদস্য ও একজন সর্দার থাকে। সাধারণত সর্দার মৌলভীবাজার শহরে অবৈধ কাঠ ব্যবসায়ীর সাথে চুক্তি করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অগ্রিম টাকাও নিয়ে থাকে। এই দল রাতে বনে যেয়ে গাছ কাটে। এরপর এই গাছকে বিভিন্ন সাইজে কেটে রদ্দা করে এবং রাস্তার নিকটবর্তী কোনো স্থানে এনে জমা করে রাখে। দিনের বেলায় এরা বনে থাকে না। এভাবে ১০০-১৫০ ঘনফুট কাঠ কাটার পর তা ছোট ট্রাকে করে মৌলভীবাজার সদরে ব্যবসায়ীর কাছে পৌছে দেয়। এক্ষেত্রে প্রতিটি কাঠ চুরির দল প্রতি রাতে সংশ্লিষ্ট বনরক্ষীকে ১,৫০০-২,০০০ টাকা ঘুষ দিয়ে থাকে। চোরাইকৃত কাঠ বন থেকে শহরে নিয়ে যাওয়ার সময় ট্রাক প্রতি ফরেস্টার বা ফরেস্ট অফিসারকে ১০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। এছাড়া পুলিশকে ট্রাকপ্রতি ১,০০০-১,৫০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। (সারণি ৩.৪ দ্রষ্টব্য)

সারণি ৩.৪: প্রতি ট্রাক কাঠ পাচারের ক্ষেত্রে অবৈধ অর্থের লেনদেন

ক্রমিক নং	অবৈধ অর্থ গ্রহীতার নাম	অবৈধ অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১	বন বিভাগ (হোম পারমিটের জন্য)	১২,০০০
২	বন রক্ষী (প্রতি রাত)	১,৫০০
৩	ফরেস্ট অফিসার (প্রতি ট্রাক)	১০,০০০
৪	পুলিশ চেকপোস্ট (প্রতি ট্রাক)	১,০০০

বন থেকে চোরাই কাঠ সাধারণত ট্রাকে পরিবহণ করা হয়। তবে ট্রাকে করে কাঠ আনার ক্ষেত্রে ঘুষ বেশি দিতে হয় এবং পুলিশের কাছে ধরা পড়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। এ কারণে ২০-২৫% চোরাই কাঠ ঠেলাগাড়িতে করেও শহরে আনা হয়। প্রতি ঠেলাগাড়িতে গড়ে ১৫ ঘনফুট কাঠ আনা হয়। এজন্য পথে প্রতি ঠেলাগাড়ির জন্য ফরেস্ট অফিসারকে ১,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়।

গত ৩/৪ বছর ধরে রেলের মাধ্যমেও প্রচুর কাঠ পাচার হচ্ছে। কমলগঞ্জ, শমসের নগর, লংলা, সাতগাঁও, সাটিয়া, জুরি এসব রেলস্টেশনের মাধ্যমে রেলে করে কাঠ পাচারের প্রবণতা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রেলযোগে বর্তমানে মোট চোরাই কাঠের প্রায় ২০% কাঠ পাচার হচ্ছে। চেক কম হওয়ার কারণে রেলে কাঠ পাচার সুবিধাজনক। বন থেকে কাঠ কেটে সেটা ঠেলাগাড়ি করে নিকটবর্তী রেলস্টেশনে নিয়ে আসা হয়। ট্রেনের লেবাররা ট্রেনে কাঠ লোড করে। ট্রেনের লেবারদেরকে এজন্য ঘনফুট প্রতি ২০-২৫ টাকা দেয়া হয়। এছাড়া জিআরপি (রেলওয়ে পুলিশ) প্রতি ১০০ ঘনফুট কাঠের জন্য গড়ে ২৫০০ টাকা এবং রেলের গার্ডরা ৫০০ টাকা করে ঘুষ নেয়। রেলের মাধ্যমে শুধুমাত্র সিলেটেই কাঠ পাচার করা হয়। সেখান থেকে পিকআপে করে কাঠ ব্যবসায়ীদের গুদামে পৌছে দেয়া হয়। মোট চোরাই কাঠের ২৫% সিলেটে রদ্দা বা গোল হিসেবে পাচার হয়।

সারণি ৩.৫: রেলওয়ের মাধ্যমে কাঠ পাচারের ক্ষেত্রে অবৈধ অর্থের লেনদেন

ক্রমিক নং	অবৈধ অর্থ গ্রহীতার নাম	অবৈধ অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১	ট্রেন লেবার (প্রতি ১০০সিএফটি)	২০০০
২	জিআরপি (প্রতি ১০০ সিএফটি)	২৫০০
৩	রেল গার্ড (প্রতি ১০০ সিএফটি)	৫০০

সংরক্ষিত বন থেকে এভাবে কাঠ চুরির ক্ষেত্রে অনেক কাঠ নষ্টও হয়। কেননা কাঠ চোররা একটা গাছ কাটার পর শুধুমাত্র গাছের ভালো অংশ বা সহজে বহনযোগ্য গুঁড়িটুকু নিয়ে যায়। বাকি প্রায় ৩০% কাঠ বনেই ফেলে রেখে আসে যা পরে পচে যায় বা নষ্ট হয়।

হবিগঞ্জ অঞ্চল হতে কাঠ পাচার প্রক্রিয়া

হবিগঞ্জে প্রায় ২০০০ কাঠ ব্যবসায়ী আছে। তবে এদের মধ্যে ১০৭ জন লাইসেন্সধারী কাঠ ব্যবসায়ী। শুধুমাত্র লাইসেন্সধারী কাঠ ব্যবসায়ীরা সংরক্ষিত বনের লটের কাঠ এবং বন বিভাগ কর্তৃক জব্দকৃত চোরাই কাঠের নিলামে অংশগ্রহণ করে থাকে। হবিগঞ্জে বছরে গড়ে প্রায় ৪.৫ লক্ষ সিএফটি কাঠ লট ও জব্দ হিসেবে নিলাম করা হয়।

সারণি ৩.৬: বার্ষিক কাঠ চুরির পরিমাণ ও বাজার মূল্য

এলাকার নাম	প্রতিদিন কাঠ চুরির পরিমাণ (সিএফটি)	বছরে কাঠ চুরির পরিমাণ (সিএফটি)	গড় বাজার মূল্য (টাকা)
মৌলভীবাজার	১২০০	৪,৩৮,০০০	৩২,৮৫,০০,০০০
হবিগঞ্জ	১০০০	৩,৬৫,০০০	২৭,৩৭,৫০,০০০
মোট	**২২০০**	**৮,০৩,০০০**	**৬০,২২,৫০,০০০**

হবিগঞ্জে সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে নিয়মিত কাঠ চুরি ও পাচার হয়। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১,২০০ সিএফটি কাঠ চুরি হয় বলে অভিযোগ আছে। সংরক্ষিত বনের কাঠ চুরির জন্য এখানে বেশ কয়েকটি দল আছে। এই সকল চোরের দলের সর্দার বা মাঝির সাথে অবৈধ কাঠ ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ থাকে। অবৈধ কাঠ ব্যবসায়ীরা এই সর্দারদেরকে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ করে। চুক্তি অনুযায়ী কাঠ চোরের দল সংরক্ষিত বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে শহরে অবৈধ কাঠ ব্যবসায়ীর কাছে পৌঁছে দেয়। কাঠ চুরির জন্য চোরের দল সংশ্লিষ্ট বনরক্ষীকে প্রতিরাতে ১০০০ টাকা করে ঘুষ দিয়ে থাকে। এরকম যে কয়টি দল যে কয়টি বিটে কাঠ চুরি করে তাদের প্রত্যেক গ্রুপকে সংশ্লিষ্ট বিটের বনরক্ষীকে ঘুষ দিতে হয়। এভাবে প্রতি রাতে হবিগঞ্জের বিভিন্ন বিট থেকে গড়ে ১২০০ সিএফটি কাঠ চুরি হয়। চোরের দল গাছ কেটে ঘাড়ে করে বনের নিকটবর্তী কোন রাস্তার

পাশে লুকিয়ে রাখে। পরে ছোট ট্রাকের মাধ্যমে কাঠ শহরে নিয়ে আসে। ১০০-১২০ সিএফটি কাঠ ভর্তি ট্রাক শহরে আনার সময় ট্রাক প্রতি সংশ্লিষ্ট বন অফিসের কর্মকর্তাকে ১২,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। একই সময় টহল পুলিশকে ট্রাক প্রতি ১,০০০ টাকা করে ঘুষ দিতে হয়। এছাড়াও চোরের দলগুলো মাসিক হারে বন অফিসকে ৫০০ টাকা এবং স্থানীয় থানাকে ৫০০ টাকা দিয়ে থাকে।

চিত্র ৩.৪: হবিগঞ্জ থেকে কাঠ পাচার

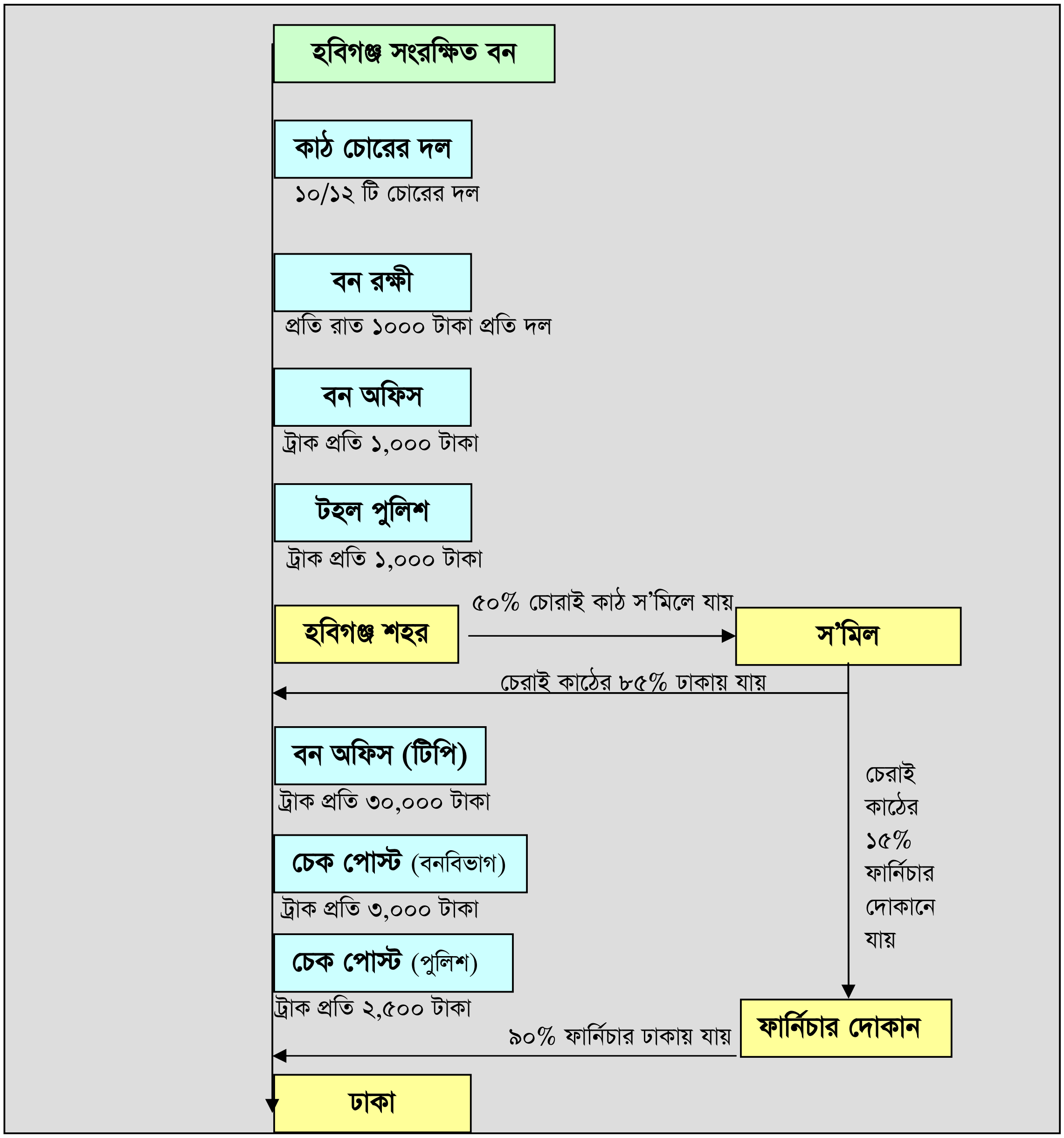

কাঠ চোরের দল বন থেকে কাঠ চুরি করে শহরে নিয়ে আসার পর অবৈধ ব্যবসায়ীরা এই কাঠ কোন গোপনীয় স্থানে বা স'মিলে লুকিয়ে রাখে। চোরাই কাঠের ৫০% গোল বা রদ্দা হিসেবে ঢাকা পাচার করা হয় এবং বাকি ৫০% স'মিল থেকে চেরাই করে কিছু ফার্নিচার হিসেবে এবং বাকিটা চেরাই কাঠ হিসেবে ঢাকায় পাঠানো হয়। হবিগঞ্জ শহর থেকে চোরাই কাঠ বড় ট্রাকে করে ঢাকায় পাঠানো হয়। প্রতি ট্রাকে গড়ে প্রায় ৩০০ সিএফটি কাঠ থাকে। এই কাঠের উপর অন্যান্য পণ্য, যেমন সব্জি, বা খাদ্যশস্য, ফলমূল বহন করা হয়। চোরাই কাঠভর্তি ট্রাক শহর থেকে বের হওয়ার জন্য বন বিভাগকে ট্রাক প্রতি ৩০,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। এছাড়া হবিগঞ্জ থেকে ঢাকা পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি চেক পোস্টে গড়ে ৩,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। হবিগঞ্জ থেকে ঢাকা যেতে সিলেট বন বিভাগের ২টি চেকপোস্ট, যথা শায়েস্তাগঞ্জ ও জগদ্দিশপুর পার হতে হয়। এছাড়াও টহল পুলিশকেও ট্রাক প্রতি গড়ে ২ হাজার ৫শত টাকা ঘুষ দিতে হয়।

সারণি ৩.৭: সংরক্ষিত বন হতে শহরে কাঠ পাচার

ক্রমিক নং	অবৈধ অর্থ গ্রহীতার নাম	অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১	বনরক্ষী (প্রতি রাত)	১,০০০
২	বন বিভাগের কর্মকর্তা (প্রতি ট্রাক)	১২,০০০
৩	টহল পুলিশ (প্রতি ট্রাক)	১,০০০
৪	বন বিভাগ (মাসিক চাঁদা)	৫০০
৫	স্থানীয় থানা (মাসিক চাঁদা)	৫০০

হবিগঞ্জের ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি বা বাগানের গাছ কাটার জন্য সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ থেকে হোম পারমিট নিতে হয়। কিন্তু হোম পারমিট নেওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণের ঝামেলা এবং প্রতি পদে পদে ঘুষ নামক হয়রানি থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকেরা হোম পারমিট ছাড়াই অনেক সময় গাছ কেটে ফেলে, বিশেষ করে গাছের সংখ্যা কম হলে। হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার অঞ্চলে হোম পারমিট সিলেটে বন অফিস থেকে ইস্যু করার কারণে সময়ও বেশি লাগে। তবে এক্ষেত্রে কাঠ বিক্রির সময় তারা বাজার মূল্যের প্রায় ৩০% কম মূল্যে কাঠ বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

সারণি ৩.৮: হবিগঞ্জ হতে ঢাকায় কাঠ পাচার

ক্রমিক নং	অবৈধ অর্থ গ্রহীতার নাম	অবৈধ অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১	বন বিভাগ (হোম পারমিট)	৩০,০০০
২	বন বিভাগ (টি.পি. বাগানের কাঠ) প্রতি ট্রাক	৫,০০০
৩	বন বিভাগ (টি.পি. চোরাই কাঠ) প্রতি ট্রাক	৩০,০০০
৪	চেকপোস্ট (বন বিভাগ)	৩,০০০
৫	চেকপোস্ট (পুলিশ)	২,৫০০

অন্যদিকে বাগান থেকে বেশি পরিমাণে অর্থাৎ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঠ কাটতে হলে হোম পারমিট নিতেই হয়। সেক্ষেত্রে প্রতি হোম পারমিটে ১০০০-১৫০০ সিএফটি কাঠ কাটার অনুমতি দেওয়া হয় এবং প্রতি হোম পারমিটের জন্য গড়ে ৩০,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। পরে এই কাঠ পরিবহণের জন্য টিপি গ্রহণের উদ্দেশ্যে আবারও ট্রাক প্রতি ৫,০০০ টাকা করে ঘুষ দিতে হয়।

সুন্দরবন থেকে কাঠ পাচারের প্রক্রিয়া

সুন্দরবন সংলগ্ন খুলনা, বাগেরহাট, শরনখোলা, মংলা, পিরোজপুর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এলাকার বেশিরভাগ কাঠ ব্যবসায়ী বন বিভাগের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতায় প্রায় প্রতিনিয়ত সুন্দরীসহ বিভিন্ন মূল্যবান গাছের কাঠ পাচার করে আসছে। সুন্দরবনের কাঠ পাচারের সঙ্গে বন বিভাগের একশ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, স্থানীয় সাংবাদিক এবং স্থানীয় প্রশাসনের কতিপয় অসৎ কর্মকর্তা জড়িত।

বিভিন্ন কৌশলে সুন্দরবন থেকে দিনে-রাতে কাঠ পাচার করা হয়। সুন্দরবনের আশে পাশের এলাকায় বিশেষ করে মংলায় কিছু প্রভাবশালী কাঠচোর সিন্ডিকেট রয়েছে। এরা কম খরচে কাঠ চুরির জন্যে (একবার ব্যবহার উপযোগী) ট্রলার নির্মাণ করে, যাতে কাঠ পাচারের সময় আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়লে বা ট্রলার আটক হলে খুব বেশি লোকসান না হয়। এসব ট্রলারে চুক্তিবদ্ধ ১০/১৫ জন শ্রমিককে কাঠ কাটার জন্যে নিয়োগ দেয়া হয়। শ্রমিকদের জনপ্রতি ২/৩ হাজার অগ্রিম টাকা আর একমাসের খাদ্য-রসদ দিয়ে ৩/৪টি ট্রলারে একসাথে বনে পাঠানো হয়। গভীর জঙ্গলে এসব শ্রমিক কাঠ কাটে। সংশ্লিষ্ট বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আগেই সমঝোতা থাকায় এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না। চোরাই কাঠ নিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে বা বাজারে পৌঁছানোর পথে অবস্থিত পুলিশ স্টেশনগুলো আগে থেকেই ম্যানেজ করা থাকে।

একজন বন কর্মকর্তা অভিযোগ করেন, এরকম চোরাইকাঠ বোঝাই একটি ট্রলার ধাওয়া করার সময় বিপরীত দিক থেকে পুলিশের একটি দ্রুতগামী ট্রলার এসে কাঠের ট্রলারের কাঠচোরদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পরে তিনি কাঠবোঝাই ট্রলারটি টেনে নিয়ে নিকটস্থ থানায় জমা দেন এবং মামলা করেন। মামলা করার সময় থানাতে তিনি ঐ কাঠচোরদের দেখতে পান, কিন্তু প্রমাণ না থাকায় এবং হাতেনাতে আটক করতে না পারায় তাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেননি।

বন বিভাগের ভাষ্য মতে, ট্রলারগুলো দ্রুত গতিসম্পন্ন হওয়ার কারণে বন বিভাগের ট্রলার ধাওয়া করে ওই সব চোরাই কাঠের ট্রলার আটক করতে পারে না। সুন্দরবনেব বাইরে অবস্থানের সময় ওইসব ট্রলার আটক করা বন বিভাগের জন্যে কষ্টকর। কিন্তু পূর্ব থেকে সমঝোতা থাকায় থানা পুলিশও অবৈধ কাঠ বোঝাই ট্রলার আটক করে না।

গাছ পাচারের অন্যতম অভিনব উপায় হচ্ছে 'ভুর'। এক্ষেত্রে সুন্দরী গাছ কেটে ভেলার মতো সাজানো হয়। তারপর গোলপাতা গাছের গোড়া বা 'মেড়' কাঠের উপরে দিয়ে কাঠ ভাসিয়ে দেয়া হয়। গোলের মেড় বা গোলপাতার গোড়ার সাথে কাঠ শক্ত করে বাঁধা থাকে। প্রতি ভুরে ৫০ থেকে ২০০ ঘনফুট পর্যন্ত কাঠ পাচার হয়ে থাকে। অমাবস্যার গোণে মাঝনদী, খাল দিয়ে 'ভুর' ভাসিয়ে দেয়া হয়। সাধারণত বর্ষার সময় এই ভুরের চালান বেশি যায়। মূলত বলেশ্বর, পশুর ও শিবসা এই তিনটি নদী দিয়ে এই ভুরের চালান বেশি পাচার হয়ে থাকে। পশুর নদী দিয়ে মরা পশুর, ভদ্রা ও হাড়বেড়িয়ার কাঠও পাচার হয়ে থাকে। এই তিনটি নদীতে প্রতি মাসে গড়ে ৫০০০ ঘনফুট কাঠ পাচার হয়ে থাকে। অর্থাৎ বছরে প্রায় ছয় (৬) কোটি টাকার কাঠ এই তিনটি নদী দিয়ে ভুর হিসেবে পাচার করা হয়।

সুন্দরবন থেকে অবৈধ কাঠ পাচারের অন্যতম প্রধান ও নিয়মিত মাধ্যম হচ্ছে গোলপাতা ও গরানের নৌকা এবং জেলে নৌকা। সুন্দরবনের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে জলভাগ। আর এই বিস্তীর্ণ জলভাগে প্রায় সারা বছর হাজার হাজার জেলে মাছ ও কাঁকড়া ধরে। মাছ ধরার সময়ে নিজস্ব প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিছু জ্বালানি সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হয়। এই সুযোগে মাছ ধরে ফিরে আসার সময় জেলেরা অতিরিক্ত জ্বালানি বিক্রির জন্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। এই সকল জেলে নৌকা গড়ে প্রতি ট্রিপে ২০ মন জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে। এছাড়া প্রায় ১০% জেলে নৌকা সুন্দরবন থেকে গড়ে ১৫ সিএফটি সুন্দরী ও পশুর কাঠ চুরি করে নিয়ে আসে।

অন্যদিকে গোলপাতা ও গরানের নৌকায় জ্বালানি কাঠসহ গোলপাতার নিচে এবং গরানের সাথে অবৈধভাবে সুন্দরীসহ অন্যান্য মূল্যবান কাঠ কেটে নিয়ে আসে। এই সকল নৌকার ক্ষেত্রে বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে পূর্ব থেকে সমঝোতা থাকায় কাঠ পাচারে কোনো সমস্যা হয় না।

গোলপাতার এসব নৌকায় বাওয়ালীরা গড়ে প্রায় ২০০ মণ জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৬,০০০ টাকা। গোলপাতা ভর্তি এই নৌকা ফিরতি পথে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নৌকার দুইপাশে ১০টি বড় গরান গাছের গুঁড়ি ভারা হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি থাকলেও বাওয়ালীরা ১০টি গুঁড়ির স্থলে অতিরিক্ত ওজনের ভারসাম্য রক্ষায় এবং বাণিজ্যিক লাভের আশায় গড়ে প্রায় ৩০টি গাছ ভারা হিসেবে ব্যবহার করে। এছাড়াও প্রায় সকল বাওয়ালীই গোলপাতা বা গরানের নিচে গড়ে ৫০ সিএফটি সুন্দরী ও পশুর কাঠ নিয়ে আসে। বন বিভাগের কর্মকর্তারা অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে বাওয়ালীদেরকে এই সকল অনিয়মে বাধা দেয় না। এভাবে প্রতি বছর গোলপাতা ও জেলে নৌকায় কমপক্ষে গড়ে প্রায় ১৩৫ কোটি টাকার কাঠ পাচার হচ্ছে।

সারণি ৩.৯: গোলপাতা ও জেলে নৌকায় বার্ষিক কাঠ পাচারের পরিমাণ ও তার বাজার মূল্য

কাঠ পাচারকারী	মোট নৌকার সংখ্যা (প্রায়)	গড় ট্রিপের সংখ্যা (বাৎসরিক)	গড়ে মোট ট্রিপের সংখ্যা	প্রতি ট্রিপে চোরাই কাঠের পরিমাণ	মোট কাঠের পরিমান (সিএফটি/মণ)	বাজার মূল্য (সিএফটি-১০০০ টাকা ও মণ-৩০ টাকা)
বাওয়ালী (চোরাই কাঠ)	৮৫০	২.৫	২১২৫	৫০ সিএফটি	১০৬,২৫০	১০৬,২৫০,০০০
বাওয়ালী (জ্বালানী কাঠ)	৮৫০	২.৫	২১২৫	২০০ মণ	৪২৫,০০০	১২,৭৫০,০০০
জেলে (জ্বালানী কাঠ)	৩৫০০০	১৮	৬৩০০০০	১৫ মণ	৯,৪৫০,০০০	২৮৩,৫০০,০০০
১০% জেলে (চোরাই কাঠ)	৩৫০০	১৮	৬৩০০০	১৫ সিএফটি	৯৪৫,০০০	৯৪৫,০০০,০০০
সর্বমোট বাজার মূল্য						**১,৩৪৭,৫০০,০০০**

এছাড়াও বন বিভাগের বিভিন্ন স্টেশন ও ক্যাম্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা স্থানীয় দরিদ্র গ্রামবাসীদের অফিস লেবার হিসেবে নিয়োগ করে তাদের দ্বারা বনের বিভিন্ন স্থানে কাঠ কাটিয়ে লুকিয়ে রেখে সুযোগ বুঝে পাচার করে দেয়।

বন বিভাগের বিভিন্ন অফিসে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসেবে পানি সরবরাহকারী শ্রমিকদেরকে সুন্দরীসহ অন্যান্য কাঠ ও জ্বালানি কাঠ নেওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। খাওয়ার পানি ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের সুবিধার্থে প্রতি টহল ফাঁড়িতে বেসরকারিভাবে দুই জন লেবার ও একটি নৌকা থাকে। এদেরকে প্রতি মাসে দুই (২) নৌকা জ্বালানি কাঠ দেয়া হয়। প্রতি নৌকায় সাধারণত ৫০ মণ জ্বালানি কাঠ থাকে অর্থাৎ মাসে ৩২০০ টাকার প্রায় ১০০ মণ জ্বালানি কাঠ দেওয়া হয়। এই সুযোগে বনজীবী ও পানি সরবরাহকারীরা অতিরিক্ত পরিমাণে সুন্দরী গাছ কেটে ডুম ও জ্বালানি করে পাচার করে। এই

সুযোগ নেওয়ার জন্য পানি সরবরাহের বোট পরিচালনার ক্ষেত্রেও সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে, যার নেতৃত্ব দিয়ে থাকে স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা।

প্রতিটি স্টেশনে একজন রাইটার বেসরকারিভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই রাইটারের কাজ হচ্ছে স্টেশনের যাবতীয় বৈধ-অবৈধ আর্থিক লেনদেনের হিসাব রাখা এবং আদায়কৃত রাজস্বের সমন্বয় সাধন করা। রাইটারকে এজন্য মাসে ৩০০০ টাকা দেওয়া হয়। স্টেশনের বিভিন্ন খাতে আয়কৃত অবৈধ অর্থ হতে এ সকল ব্যয় বহন করা হয়।

জেলে নৌকাগুলো প্রতি ট্রিপেই নোঙ্গর বানানোর জন্য সুন্দরবন থেকে সুন্দরী ও কাঁকড়া কাঠ সংগ্রহ করে। ৭-৮ ফিট লম্বা এই নোঙ্গর বানানোর জন্য কাঠ সংগ্রহে বন বিভাগকে নোঙ্গর প্রতি ৫০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। ট্রিপ থেকে ফিরে এসে প্রতিটি নোঙ্গর ২০০-৩০০ টাকা দরে বিক্রি হয়।

বনের সব স্থান থেকে একই পরিমাণে কাঠ পাচার হয় না। কিছু স্থান রয়েছে যেখান থেকে প্রতিনিয়ত কাঠ পাচার হচ্ছে। যেমন সুন্দরবনের মংলায় চাঁদপাই রেঞ্জের করমজল, বড় জোংড়া, ছোট জোংড়া, পশবুনিয়া, বস্তারখাল, আন্দরকিল্লা, পোড়া মহল, নন্দবালা, মৃগেশারি, ইন্দুরকৌটা, ইন্দুরকানি, চরপুটিয়া, শেলার ভরানী, ডাকাতের খাল, হরজাম, গোশিয়া; খুলনা নলিয়ান রেঞ্জের সুতোর খালি, নলিয়ান, কাশিয়াবাদ; সাতক্ষীরা বুড়িগোয়ালিনি রেঞ্জের কৈখালি, কদমতলা, কোবাদক ও বাগেরহাট শরণখোলা রেঞ্জের বগি, সুপতি এলাকা ছাড়াও দুবলার ১০টি চরের আশপাশের বনাঞ্চল থেকে হাজার হাজার সুন্দরী গাছ পাচার হয়ে গেছে।

৩.৩ অবৈধ কাঠ ব্যবহার ও পাচারে স'মিলের ভূমিকা

রাঙ্গামাটি সার্কেলের অধীনে মোট ১১৬টি স'মিল আছে। এর মধ্যে ৩৯টি অবৈধ অর্থাৎ লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে অথবা লাইসেন্স নেই। এছাড়া বান্দরবান শহরে প্রায় ১৭টি স'মিল আছে।

রাঙ্গামাটি সার্কেলে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে সংগ্রহকৃত অবৈধ বা চোরাই কাঠের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কাঠ এই সকল স'মিলে চেরাই করে চেরাই কাঠ হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। পূর্বে এই সকল স'মিলে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৮০ সিএফটি কাঠ চেরাই করা হতো। বর্ষা মৌসুমের দুই মাস এই কাঠ কাটার পরিমাণ ছিলো প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২০ সিএফটি। রাতে কাঠ কাটা নিষিদ্ধ থাকায় যখন কাজের চাপ বেশি থাকতো তখন প্রতি রাতের জন্য সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তাকে গড়ে ৮০০ টাকা ঘুষ দিয়ে অধিক রাত পর্যন্ত কাঠ চেরাই করা হতো। সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে চুরি করে আনা কাঠ বা কাগজবিহীন অবৈধ কাঠ কাটার জন্য বন বিভাগ, ডিসি অফিস ও স্থানীয় থানায় প্রতি স'মিল থেকে নির্দিষ্ট হারে মাসিক চাঁদা দিতে হতো। বর্তমানে স'মিলগুলোতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২৫ সিএফটি কাঠ চেরাই করা হয় যার এক-তৃতীয়াংশ আসে সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে। অনুরূপভাবে, বান্দরবানের স'মিল গুলোতে প্রতিদিন প্রায় ৫৫ সিএফটি কাঠ চেরাই করা হয়, যার প্রায় ৮০% কাঠ সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়।

সারণি ৩.১০: রাঙামাটি সার্কেলের অধীন স'মিল সংক্রান্ত তথ্য

সার্কেল	বন বিভাগ	স' মিলের সংখ্যা	লাইসেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণ স' মিলের সংখ্যা	লাইসেন্সবিহীন
রাঙামাটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর	১	-	-
	পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ	২৪	৫	-
	অশ্রেণীভুক্ত রাঙামাটি বনাঞ্চল	২	-	-
	কাপ্তাই পাল্পউড বন	১	১	-
	খাগড়াছড়ি বন বিভাগ	৭৭	১৯	৩
	জুম নিয়ন্ত্রণ বন	১১	৫	৬
	মোট	**১১৬**	**৩০**	**৯**

সূত্রঃ রাঙ্গামাটি সার্কেল বন বিভাগ, ডিসেম্বর ২০০৬

লামা, আলীকদম, নাইক্ষংছড়ি ও চকরিয়া অঞ্চলে বর্তমানে প্রায় ৩৭টি স'মিল আছে। এর মধ্যে ৬টি স'মিল বন বিভাগের অননুমোদিত সীমার মধ্যে অবস্থিত। বন বিভাগের অননুমোদিত সীমার ভিতরে স'মিল স্থাপনে বন বিভাগকে গড়ে ৬০,০০০ টাকা এবং ডিসি অফিসে গড়ে ৪০,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। তবে বৈধ সীমার ভিতর স'মিল স্থাপনেও বন বিভাগকে ২৫,০০০ টাকা এবং ডিসি অফিসে ১৫,০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়।

সারণি ৩.১১: বিভিন্ন স্থানে স'মিল হতে আদায়কৃত অবৈধ অর্থের পরিমাণ

এলাকার নাম	অর্থ প্রদানের খাত	বন বিভাগ	ডিসি অফিস
রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি	স'মিল স্থাপনের জন্য	৬০,০০০	৩০,০০০
	মাসিক চাঁদা	৩,০০০	১,০০০
বান্দরবান	স'মিল স্থাপনের জন্য	৯০,০০০	৪০,০০০
	মাসিক চাঁদা	২,০০০	১,০০০
লামা-আলীকদম-নাইক্ষ্যংছড়ি-চকরিয়া	স'মিল স্থাপনের জন্য	৬০,০০০	৪০,০০০
	মাসিক চাঁদা	১,০০০	১,০০০
মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ	স'মিল স্থাপনের জন্য	১,৫০,০০০	৩০,০০০
	মাসিক চাঁদা	১,০০০	১,০০০

এখানকার স'মিলগুলোতে ২০০৫ পূর্ববর্তী সময়ে যখন অবৈধ কাঠের ব্যবসা খুব বেশি পরিমাণে হতো, তখন প্রতিদিন গড়ে ১০০ সিএফটি কাঠ কাটা হতো। এমনকি বন বিভাগে প্রতি রাতের জন্য ২০০-৩০০ টাকা ঘুষ দিয়ে দিন-রাত স'মিলে কাঠ কাটা হতো। কিন্তু বর্তমানে স'মিলগুলোতে দিনে গড়ে ৩৫ সিএফটি কাঠ কাটা হয়। আলীকদম, লামা ও নাইক্ষ্যংছড়িতে প্রায় ২১টি স'মিলে যে কাঠ কাটা হয় তার প্রায় ৮০% কাঠই সংরক্ষিত বন থেকে অবৈধভাবে সংগৃহীত। অন্যদিকে চকরিয়ার ১৬টি স'মিলে যে কাঠ চেরাই করা হয় তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ চোরাই কাঠ।

সারণি ৩.১২: স'মিলে চেরাইকৃত চোরাই কাঠের আনুমানিক পরিমাণ

এলাকার নাম	স'মিলের সংখ্যা	প্রতি দিন কাঠ চেরাই হয় (সিএফটি)	প্রতি বছর চেরাইকৃত কাঠ	চোরাই কাঠের হার (%)	মোট চোরাই কাঠের আনুমানিক পরিমাণ (সিএফটি)
রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি	১১৬	২৫	১০,৫৮,৫০০	৩৩	৩,৪৯,৩০৫
বান্দরবান	১৭	৫৫	৩,৪১,২৭৫	৮০	২,৭৩,০২০
লামা-আলীকদম-নাইক্ষ্যংছড়ি	২১	৩৫	২,৬৮,২৭৫	৮০	২,১৪,৬২০
চকরিয়া	১৬	৩৫	২,০৪,৪০০	৩০	৬১,৩২০
মৌলভীবাজার	৭২	৩০	৭,৮৮,৪০০	৩৫	২,৭৫,৯৪০
হবিগঞ্জ	৬৫	৩০	৭,১১,৭৫০	৩৫	২,৪৯,১১৩
প্রতি বছর মোট চেরাইকৃত চোরাই কাঠের পরিমাণ (আনুমানিক)					**১৪,২৩,৩১৮**

অর্থাৎ লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি এবং চকরিয়ার স'মিলগুলোতে প্রতি বছর প্রায় ২,৭৫,৯৪০ সিএফটি চোরাই কাঠ চেরাই হয়। এই চেরাইকৃত কাঠের প্রায় ৯০% কাঠই স্থানীয় ফার্নিচারের দোকানে ব্যবহার করা হয়। বাকি কাঠ চেরাই হিসেবে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার হয়।

মৌলভীবাজারে বর্তমানে প্রায় ৭২টি স'মিল আছে। মৌলভীবাজার শহরে ১১৩টি স'মিল ছিল। এর মধ্যে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৪১টি অবৈধ স'মিল উচ্ছেদ করেছে। এছাড়া ৫৯টি স'মিল হাইকোর্টের মামলার মাধ্যমে স্থগিতাদেশ করিয়ে ব্যবসা চালু রেখেছে।

এসব স'মিলে গড়ে প্রতিদিন ৩০ সিএফটি কাঠ কাটা হয়, যার এক-তৃতীয়াংশ চোরাই কাঠ। সংরক্ষিত বন থেকে চোরাই কাঠ অবৈধ ব্যবসায়ীরা এই সমিলগুলোতে নিয়ে আসে এবং চেরাই করে। স'মিল থেকে প্রতি মাসে স্থানীয় থানাকে ১,০০০ টাকা এবং স্থানীয় বন অফিসকে ১,০০০ টাকা করে চাঁদা দিতে হয়। এসব স'মিলে প্রতি সিএফটি কাঠ কাটতে ১৬-২২ টাকা দিতে হয়। তবে অবৈধ কাঠ চেরাই করতে প্রতি সিএফটি ৫০ টাকা দিতে হয়। অবৈধ স'মিল স্থাপনে বন বিভাগকে গড়ে ১.৫ লক্ষ টাকা এবং ডিসি অফিসে গড়ে ৩০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়।

হবিগঞ্জে মোট ৬৫টি স'মিল আছে। স'মিলগুলোতে ঘন্টায় গড়ে ৫-৬ সিএফটি কাঠ কাটা হয়। এই স'মিলগুলোতে বছরে ৩ মাস ১০-১২ ঘন্টা কাজ হয়। অন্যান্য সময় দিনে গড়ে ৪ ঘন্টা কাঠ কাটার কাজ হয়। সবমিলিয়ে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০ সিএফটি কাঠ কাটা হয়। হবিগঞ্জের স'মিল সমূহে যে সকল কাঠ চেরাই হয় তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত বন থেকে চোরাই কাঠ। বাকি এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের লটের কাঠ এবং বাকি অংশ স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত।

হবিগঞ্জের সমিলগুলোকে প্রতি মাসে বন বিভাগকে ১০০০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। অন্যদিকে স'মিল স্থাপনের সময়ও বন বিভাগকে গড়ে ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়। এছাড়াও ডিসি অফিস ঘুষ দিতে হয় গড়ে ৩০ হাজার টাকা। স'মিলের কাঠ কাটার মূল্য বা দর সিএফটি প্রতি ১৬-২২ টাকা। সেগুন কাঠের জন্য সিএফটি প্রতি ২৫ টাকা এবং চোরাই কাঠের জন্য সিএফটি প্রতি ৫০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়।

৩.৪ কাঠ পাচারে ফার্নিচার দোকানের ভূমিকা

রাঙ্গামাটিতে বর্তমানে প্রায় ৭০০টি ফার্নিচারের দোকান আছে। তন্মধ্যে ফার্নিচার দোকান মালিক সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৫০। ২০০৫ পূর্ববর্তী সময়ে এই সংখ্যা আরও বেশি ছিল। বর্তমান ফার্নিচার দোকানগুলোর ৫০% দোকানই অবৈধ। ডিসি অফিসের বিভিন্ন স্তরে বাৎসরিক ১০-১৫ হাজার টাকা দিয়ে অবৈধ দোকানের ব্যবসা সচল রয়েছে।

সরকারি নিয়মানুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বদলি হয়ে যাওয়ার সময় বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এক সেট নতুন ফার্নিচার নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে এই নিয়মের আড়ালে ডিসি অফিস ও বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ঘুষ দিয়ে ২-৩ সেট ফার্নিচার নিয়ে থাকেন। এছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রামের এক শ্রেণীর ফার্নিচার ব্যবসায়ী ডিসি অফিস থেকে ঘুষের বিনিময়ে টিপি সংগ্রহ করে এবং ফার্নিচার পাচার করে। এক্ষেত্রে প্রতি ট্রাক ফার্নিচারের জন্য ১০-১২ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। অনেক সময় এই সকল টিপি একাধিকবার ব্যবহৃত হয়। ডিসি অফিস বন আইন না মেনে বন বিভাগকে পাশ কাটিয়ে এই টিপি ইস্যু করে থাকে।

২০০৫ পূর্ববর্তী সময়ে এই সকল ফার্নিচারের দোকানে দোকানপ্রতি মাসিক কাঠের চাহিদা ছিল গড়ে ৭০ সিএফটি যা বর্তমানে ২৫ সিএফটির বেশি নয়। এই সকল ফার্নিচারের দোকানে ফার্নিচার তৈরিতে প্রধানত সেগুন কাঠ ব্যবহার করা হয়। শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষেত্রে অন্যান্য কাঠ যথা গামারী ও কড়ই কাঠ ব্যবহৃত হয়। রাঙ্গামাটির এই সকল ফার্নিচারের দোকানে ব্যবহৃত কাঠের প্রায় ৯০% কাঠই সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়।

বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে যথাক্রমে প্রায় ৪৫০টি ও প্রায় ২৫০টি ফার্নিচারের দোকান রয়েছে। এসব দোকানে বর্তমানে প্রতি মাসে গড়ে ২৫ সিএফটি কাঠ প্রয়োজন হয়, যার প্রায় ৯০% সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে অবৈধভাবে সংগৃহীত কাঠ। বান্দরবানের ফার্নিচার দোকানের মধ্যে মাত্র ১০টি দোকানের ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে।

লামাতে ১০০টি আলীকদমে ১২৫টি, নাইক্ষ্যংছড়িতে ৭০টি এবং চকরিয়াতে ১৫০টি ফার্নিচারের দোকান রয়েছে। মূলত সংরক্ষিত বনের অবৈধ কাঠের উপর নির্ভর করেই এই সকল ফার্নিচার দোকান গড়ে উঠেছে। ২০০৫ সালে পূর্ববর্তী সময়ে এই সকল দোকানে প্রতি মাসে গড়ে ৭০ সিএফটি কাঠের ফার্নিচার তৈরি হতো। বর্তমানে প্রতিটি দোকানে প্রতি মাসে গড়ে ৩৫ সিএফটি কাঠ ব্যবহার করা হয়। এই অঞ্চলের ফার্নিচার দোকানে ব্যবহৃত কাঠের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কাঠই অবৈধভাবে সংগৃহীত। বন বিভাগ ও পুলিশের সহযোগিতায় এই সকল ফার্নিচারের দোকান চালু রাখার জন্য এবং অবৈধ কাঠ ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসে বন বিভাগকে ও স্থানীয় থানাকে দোকান প্রতি ১,০০০ টাকা করে চাঁদা দিতে হয়।

মৌলভীবাজার জেলায় প্রায় ৫০০টি ফার্নিচারের দোকান আছে। এখানে বড় দোকানে মাসে গড়ে ৭৫ সিএফটি, মাঝারি দোকানে মাসে গড়ে ৪০ সিএফটি এবং ছোট দোকানে মাসে গড়ে ২৫ সিএফটি অর্থাৎ গড়ে ৪৫ সিএফটি কাঠ ব্যবহৃত হয়। কোনো ফার্নিচারের দোকানে বন বিভাগের কর্মকর্তারা পরিদর্শনের সময় অবৈধ কাঠ পেলে বা কাগজ পত্র ঠিক না থাকলে এবং অবৈধ কাঠের মালিকের সাথে পূর্ব থেকে চুক্তি করা না থাকলে প্রতি সিএফটি অবৈধ কাঠের জন্য গড়ে ১২০ টাকা ঘুষ দিতে হয়।

সারণি ৩.১৩: ফার্নিচারের দোকানে বার্ষিক কাঠের চাহিদা (আনুমানিক)

এলাকার নাম	ফার্নিচার দোকানের সংখ্যা	কাঠের মাসিক চাহিদা (সিএফটি)	কাঠের বার্ষিক চাহিদা (সিএফটি)	চোরাই কাঠের হার (%)	চোরাই কাঠের আনুমানিক পরিমাণ (সিএফটি)
রাঙ্গামাটি	৭০০	২৫	২,১০,০০০	৯০	১,৮৯,০০০
খাগড়াছড়ি	২৫০	২৫	৭৫,০০০	৯০	৬৭,৫০০
বান্দরবান	৪৫০	২৫	১,৩৫,০০০	৯০	১,২১,৫০০
লামা-আলীকদম-নাইক্ষ্যংছড়ি ও চকরিয়া	৪৪৫	৩৫	১,৮৬,৯০০	৭০	১,৩০,৮৩০
মৌলভীবাজার	৫০০	৪৫	২,৭০,০০০	৫০	১,৩৫,০০০
হবিগঞ্জ	২৫০	৩০	৯০,০০০	৫০	৪৫,০০০
মোট কাঠের চাহিদা			**৯,৯৬,৯০০**	-	**৬,৮৮,৮৩০**

হবিগঞ্জ শহরে প্রায় ২৫০টি ফার্নিচারের দোকান আছে। স্থানীয় সংরক্ষিত বনাঞ্চলে চোরাই কাঠের সহজলভ্যতার কারণে হবিগঞ্জের চুনারুঘাট ফার্নিচারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমানে সিলেট-ঢাকা নতুন বাইপাস সড়ক নির্মিত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এই ব্যবসায় কিছুটা ভাটা পড়েছে। এখান থেকে ঢাকায় বর্তমানে শুধুমাত্র ট্রাকযোগে ফার্নিচার পরিবহণ করা হয়। পূর্বে সিলেট থেকে ঢাকাগামী যাত্রীবাহী বাসে প্রচুর পরিমাণে ফার্নিচার পাচার হত। বাইপাস সড়ক নির্মাণের পূর্বে অর্থাৎ ২০০৪-০৫ সাল পর্যন্ত এখানে প্রতি মাসে প্রতি দোকানে গড়ে ৫০ সিএফটি কাঠের ফার্নিচার তৈরি হত। বর্তমানে মাসে গড়ে ৩০ সিএফটি কাঠের বেশি ব্যবহার হয় না। হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে ফার্নিচার দোকানসমূহে ব্যবহৃত কাঠের প্রায় অর্ধেক অংশই চোরাই কাঠ। নিয়মিতভাবে না হলেও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের সময় দোকানে কোনো কাগজ পত্র ছাড়া চোরাই কাঠ পাওয়া গেলে সিএফটি প্রতি গড়ে ১২০ টাকা ঘুষ দিতে হয়।

৩.৫ বনজ সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত সংগ্রহে বন বিভাগের ভূমিকা

৩.৫.১ সুন্দরবন হতে গোলপাতা ও গরান সংগ্রহে অনিয়ম

সুন্দরবন থেকে যারা গোলপাতা ও গরান সংগ্রহ করে তাদেরকে স্থানীয় ভাষায় বাওয়ালী বলে। তবে তারা সাধারণত প্রতি বছর নভেম্বর-জানুয়ারি শুধু এই তিন মাস পাতা কাটে। অন্যান্য সময় তারাই আবার মাছ ধরা এবং মধু সংগ্রহের কাজ করে থাকে।

সারণি ৩.১৪: বিভিন্ন বছর গোলপাতা আহরণের পরিমাণ ও রাজস্বের পরিমাণ (২০০১-২০০৬)

আর্থিক সন	মোট পারমিট	মোট সংগ্রহ (মণ)	মোট রাজস্ব (টাকা)	পারমিট প্রতি সংগ্রহ (মণ)	মন প্রতি রাজস্ব (টাকা)
২০০১-২০০২	১০৩৩	৪৩৮৭৮৩	২,০৩০,৮৯৮	৪২৫	৫
২০০২-২০০৩	১৩৪০	৫৩০০১১	৩,১২৭,০৫২	৩৯৬	৬
২০০৩-২০০৪	১৩৫৪	৫৩১২৪৪	২,২৯৬,০০৬	৩৯২	৪
২০০৪-২০০৫	১৯৬৩	৭৫৩,২৭৯	৩,১২৩,৬০৯	৩৮৪	৪
২০০৫-২০০৬	১৯৩৭	৭০১৩২০	৩,১৬২,১৮৪	৩৬২	৫

সূত্র: বন বিভাগ, ২০০৮।

সাধারণত স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ১০-১২ জন বাওয়ালীর একটি দলকে একজন মাঝি বা সর্দারের অধীনে অগ্রিম টাকা দিয়ে সুন্দরবনে গোলপাতা সংগ্রহ করতে পাঠায়। সর্দাররা এই বাওয়ালী ও মহাজন বা ব্যবসায়ীর মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করে। মৌসুম শুরু হওয়ার এক মাস পূর্বেই বাওয়ালীরা মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে নৌকা মেরামত শুরু করে। আগে থেকেই দাদন নেওয়ার কারণে বাওয়ালীরা মহাজনের কাছে এক ধরনের জিম্মি হয়ে থাকে এবং গোলপাতা সংগ্রহ করে সেই মহাজনের কাছেই তার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা এই বাওয়ালীদেরকে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করে। পূর্বে এই বাওয়ালীদেরকে ব্যবসায়ী বা মহাজনদের বাঁধা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হতো না। তখন তারা নিজেদের উদ্যোগে এই গোলপাতা সংগ্রহ করত এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসা করত। ফলে বনের সাথে তাদের একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল এবং তখন তারা বনের যত্ন নিত। কিন্তু বর্তমানে মহাজনের শ্রমিক হিসেবে বনের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরী হওয়ায় পূর্বের সেই আত্মিক সম্পর্ক আর নেই। এখন বাধ্য হয়েই তাদের পক্ষে গোলপাতা কাটার ক্ষেত্রে পূর্বের মতো যত্নের সাথে অর্থাৎ নিয়ম মেনে কাটা সম্ভব হয় না।

বর্তমান গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকার বাওয়ালী ও গোলপাতা ব্যবসায়ীদের সাথে দলগত আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়, সুন্দরবনে বর্তমানে প্রতি মৌসুমে গড়ে প্রায় ৮৫৫টি নৌকা গোলপাতা ও গরান সংগ্রহ করে। নিম্নের ছকে (সারণি ৩.১৪) সুন্দরবনের রেঞ্জ ভেদে বিভিন্ন ধারণ-ক্ষমতা-সম্পন্ন নৌকার একটি গড় হিসাব দেওয়া হলো।

সারণি ৩.১৫: রেঞ্জ ও ধারণক্ষমতা অনুসারে বাওয়ালী নৌকার সংখ্যা

রেঞ্জ	৫০০ মণী	৩০০ মণী	১৫০ মণী	মোট
বুড়িগোয়ালিনী	১৯০	২৫	১০	২২৫
চাদঁপাই	১৫০	৩০	০	১৮০
নলিয়ান	২৪০	৬০	২৫	৩২৫
শরণখোলা	৯০	৩৫	০	১২৫
মোট	**৬৭০**	**১৫০**	**৩৫**	**৮৫৫**

গোলপাতা ও গরান সংগ্রহের জন্য বাওয়ালীদেরকে বন বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে বন বিভাগের মাধ্যমে সরকার রাজস্ব আদায় করে। কিন্তু একই সাথে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাওয়ালীরা বন বিভাগের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়। প্রতিটি বাওয়ালীর নৌকা থেকেই প্রতি ট্রিপে আদায় করা হয় নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত অর্থ। নিম্নের ছকে (সারণি ৩.১৫) একটি ৫০০ মণী নৌকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতে প্রদেয় অর্থের হিসাব দেওয়া হলো:

সারণি ৩.১৬: বাওয়ালী নৌকা কর্তৃক অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের স্থান ও পরিমাণ

ক্রমিক নং	রাজস্ব বা চাঁদা আদায়ের খাত	সরকারি রাজস্বের হার (প্রতি ১০০ মণ)	৫০০ মণী নৌকার জন্য সরকারি রাজস্ব	গড়ে চাঁদা আদায়	মোট চাঁদার পরিমাণ
১	নৌকার বি.এল.সি	২৪ টাকা	১২০	১,০০০	১,১২০
২	পারমিট	৪০০ টাকা	২,০০০	৮,০০০	১০,০০০
৩	কুপ (রিপোটিং)	-	-	১০,০০০	১০,০০০
৪	কুপ (চেকিং)	-	-	১,৫০০	১,৫০০
৫	টহলফাড়ি	-	-	১,৫০০	১,৫০০
৬	স্টেশন কর্মকর্তা	-	-	১,৫০০	১,৫০০
	মোট		**২,১২০**	**২৩,৫০০**	**২৫,৬২০**
৭	বনদস্যু				৫,০০০
৮	পুলিশ				১,০০০
				মোট খরচ	**৩১,৬২০**
				অতিরিক্ত খরচ	**২৯,৫০০**
				বাওয়ালী নৌকা থেকে প্রতি বছর মোট অতিরিক্ত টাকা আদায়	**৬,২৬,৮৭,৫০০**

সুতরাং দেখা যায়, ৫০০ মণী নৌকায় প্রতি ট্রিপে বিএলসিসহ প্রায় ৩১,৬২০ টাকা ফি বা চাঁদা দিতে হয়। এর মধ্যে সরকারি কোষাগারে ২,১২০ টাকা জমা হয়। বাকি প্রায় ২৩,৫০০ টাকা বন বিভাগের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ৬,০০০ টাকা বনদস্যু ও পুলিশের কাছে যায়। স্বাভাবিকভাবেই এই অতিরিক্ত খরচ পুষিয়ে নেওয়ার জন্য বাওয়ালীরা নির্ধারিত অনুমোদন অপেক্ষা গড়ে চার গুণ পণ্য বেশি সংগ্রহ করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ ৫০০ মণী নৌকায় কমপক্ষে ২০০০ মণ গোলপাতা সংগ্রহ করে থাকে। সাধারণত বন বিভাগ থেকে বিএলসি নেয়ার পর বাওয়ালীরা মূল নৌকার উপরিভাগের দু'পাশে খাড়াভাবে অতিরিক্ত দুই থেকে তিন হাত (৩ ফুট-৯ ফুট) বাড়তি কাঠের বেড়া দিয়ে নৌকার পণ্য বোঝাই ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই ব্যবস্থাকে স্থানীয় ভাষায় 'মলম' বলে। অতিরিক্ত গোলপাতা ও গরান বোঝাই করার জন্য এই মলম দেয়া নৌকা ব্যবহার করা হয়।

সারণি ৩.১৭: অতিরিক্ত গোলপাতা আহরণে প্রতি বছর সরকারের রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ

মোট গোলপাতার নৌকার সংখ্যা (প্রায়)	৮৫০ টি
গড় ট্রিপের সংখ্যা (বাৎসরিক)	২.৫ বার
গড়ে বছরে মোট ট্রিপের সংখ্যা	২১২৫ বার
প্রতি নৌকায় অতিরিক্ত গোলপাতার পরিমাণ	১,৫০০ মণ
মোট অতিরিক্ত গোলপাতা সংগ্রহের পরিমাণ	৩১,৮৭,৫০০ মণ
সরকারি রাজস্ব লোকসান (প্রতি ১০০ মণ = ৪০০ টাকা)	১,২৭,৫০,০০০ টাকা
অতিরিক্ত গোলপাতার বাজার মূল্য (১ কাহন = ১৪০০ টাকা)	২৯,০০,৬২,৫০০ টাকা

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, প্রতি বছর শুধুমাত্র বাওয়ালীদের নিকট হতে বিভিন্ন খাতে গড়ে প্রায় সোয়া ৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় করা হয়। অন্যদিকে এই অতিরিক্ত টাকার যোগান দিতে যেয়ে বাওয়ালীরা নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩২ লক্ষ মণ গোলপাতা বেশি সংগ্রহ করে, যার বাজার মূল্য প্রায় ৩০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে সরকারের রাজস্ব লোকসান হয় প্রায় সোয়া কোটি টাকা।

সাধারণত সুন্দরবনের উৎপাদন ক্ষমতা ও সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিবছর গোলপাতাসহ অন্যান্য বনজ দ্রব্য আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু বন বিভাগের একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতির কারণে প্রতিবছরই লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি বনজ দ্রব্য সংগৃহীত হয়ে থাকে। এর ফলে একদিকে সরকার তার রাজস্ব হারায়, অন্যদিকে দুর্নীতিবাজ বন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবৈধ আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ক্ষতির সম্মুখীন

হয় সুন্দরবন। অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অতিরিক্ত বনজ সম্পদ আহরণের কারণে সুন্দরবনের পুনরুৎপাদন ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

৩.৫.২ সুন্দরবনে জেলেদের মাছ সংগ্রহে অনিয়মঃ

সুন্দরবনের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে বিশাল জলভাগ। সুন্দরবন উপকূল অঞ্চলে প্রায় ৪৫০টি ছোট বড় নদী-খাল সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে জালের মতো বিস্তৃত হয়ে চারটি মোহনা দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এই এলাকার মানুষের অন্যতম প্রধান পেশা মাছ ধরা। সুন্দরবনের চারটি রেঞ্জে মোট ১৬টি স্টেশনে প্রায় ৩৬,০০০ জেলে নৌকা সারা বছর মাছ ধরে। প্রায় ১ লক্ষ মানুষ এই পেশায় সরাসরি যুক্ত। এর মধ্যে প্রায় ১৬ হাজার নৌকার বিএলসি (বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট) করা থাকে। বাকি প্রায় ২০ হাজার নৌকা বিএলসি ছাড়াই মাছ ধরে থাকে।

সাধারণত গোলপাতা ও গরানের মৌসুমে অর্থাৎ নভেম্বর থেকে জানুয়ারি এই তিন মাস অপেক্ষাকৃতভাবে কম মাছ ধরা হয়। তবে জুন থেকে অক্টোবর মাছ ধরার উপযুক্ত সময়। প্রতি মাসে দুই গোণে অর্থাৎ দুই বারে মোট ১২-১৪ দিন মাছ ধরা হয়ে থাকে।

সারণি ৩.১৮: খুলনা সার্কেলে সাদা মাছ সংগ্রহ ও রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ

সন	পারমিট সংখ্যা	পরিমাণ (মণ)	রাজস্ব (টাকা)	পারমিট প্রতি রাজস্ব
২০০২-০৩	৬৫,৮৫০	৩৫,৩৬০	২,৫৮৫,৮২৭	৩৯.৩
২০০৩-০৪	৬৫,৭৩৩	৩৯,৬০৩	৪,২১১,৩০২	৬৪.১
২০০৪-০৫	৬৪,৬৮৪	৪০,৩৪১	৪,৭১৬,৮৩১	৭২.৯
২০০৫-০৬	৬৪,৮১৮	৪৫,৬৮৯	৪,৭৭৭,১৬৮	৭৩.৭

সূত্রঃ খুলনা সার্কেল, বন বিভাগ, ২০০৭

সুন্দরবন অঞ্চলে গলদা ও বাগদা চিংড়ি, মাছের পোনা, কাঁকড়া, সাদা মাছ (পাঁচ মিশালী মাছ), জোংরা (এক ধরনের শামুক যা থেকে খাবার চুন তৈরি হয়) সংগ্রহ করা হয়। সুন্দরবন এলাকায় মাছ ধরার জন্য বন বিভাগকে নির্দিষ্ট হারে শুল্ক ও রাজস্ব দিতে হয়। এক্ষেত্রে সাদা মাছের জন্য সরকারি রাজস্ব মণ প্রতি ৮০ টাকা এবং বড় চিংড়ির জন্য মণ প্রতি ৬০০ টাকা হারে রাজস্ব নির্ধারিত রয়েছে। তবে বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এই সকল জেলেদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত শুল্ক অপেক্ষা অতিরিক্ত চাঁদা আদায় করে।

সুন্দরবনের মাছ ধরা নৌকাগুলো সাধারণত ২৫ মণ হতে সর্বোচ্চ ১০০ মণ ধারণ-ক্ষমতা-সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ নৌকা গড়ে ৩৫ মণ ধারণ-ক্ষমতা-সম্পন্ন হয়। ২৬-৫০ মণী নৌকার বিএলসি'র বার্ষিক সরকারি ফি ১২ টাকা। কিন্তু এক্ষেত্রে ২০০ থেকে ২২০ টাকা আদায় করা হয়। অর্থাৎ প্রতিবছর প্রায় ১৬,০০০ নৌকা হতে বিএলসি খাতে অতিরিক্ত আদায় করা হয় গড়ে প্রায় ৩০,০৮,০০০ টাকা।

সারণি ৩.১৯: জেলে নৌকা কর্তৃক অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের স্থান ও পরিমাণ

ক্রমিক নং	খাত	সরকার নির্ধারিত ফি	বন বিভাগ কর্তৃক আদায়কৃত ফি	অতিরিক্ত আদায় (৫০ মণী নৌকা)	বি.এল.সি খাতে মোট অতিরিক্ত বার্ষিক আদায়
১	বিএলসি (বছরে ১বার)	প্রতি ২৫ মণী নৌকা ৬ টাকা	২০০	১৮৮	৩০,০৮,০০০
২	পাশ / পারমিট (বনে প্রবেশের জন্য)	৭/= জনপ্রতি	১৪/= (২জন)	-	-
৩	টহল ফাঁড়ি (গড়ে ৩ টি) (ফাঁড়ি প্রতি গড় ৭০ টাকা)	-	২০০	২০০	১২,৯৬,০০,০০০
৪	স্টেশন (নৌকা প্রতি মাছের রাজস্ব)	মণ প্রতি ৮০ টাকা	২২০	১৫০	৯,৭২,০০,০০০
প্রতি বছর জেলে নৌকা হতে বিভিন্ন খাতে মোট অতিরিক্ত আদায়					**২২,৯৮,০৮,০০০**

এরপর বনে প্রবেশ করে মাছ ধরার জন্য দুইজনের সরকারি ফি নেওয়া হয় ১৪ টাকা। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয় না। তবে মাছ ধরার সময় প্রতিটি নৌকা গড়ে তিনটি টহল ফাঁড়ি অতিক্রম করে। প্রতিটি টহল ফাঁড়িতেই ৭০-১০০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। অর্থাৎ প্রতিটি মাছ ধরা নৌকা টহল ফাঁড়ি গুলোতে গড়ে ২০০ টাকা চাঁদা প্রদান করে থাকে।

অন্যদিকে, মাছ ধরে ফিরে আসার সময় সাধারণত দিনে জনপ্রতি ন্যূনতম ৩ কেজি হিসাবে ১টি নৌকায় ২ জন জেলের কাছ থেকে ৭ দিনে ৪২ কেজি মাছ, যার মধ্যে ৫ কেজি চিংড়ি মাছ ও বাকী ৩৭ কেজি সাদা মাছ হিসাব করে প্রতি সপ্তাহে ন্যূনতম ১৪৯ টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়। অর্থাৎ কোনও জেলে নৌকা এই পরিমান মাছ সংগ্রহ করতে না পারলেও তাকে একই পরিমাণ রাজস্ব দিতে হয়। তবে মাছের পরিমাণ বেশি হওয়ার অজুহাতে অধিকাংশ সময়ে গড়ে ২২০ টাকা রাজস্ব জমা নেয়া হয়। অথচ বন বিভাগের রেজিস্টারে মাছ সংগ্রহের সময় ৩/৪ দিন দেখানো হয় এবং মাছের পরিমাণ কম দেখিয়ে গড়ে ৭০ টাকা রাজস্ব লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও প্রতিটি নৌকা থেকে গড়ে ১৫০ টাকা বেশি আদায় করা হয়।

এভাবে প্রতিবার মাছ সংগ্রহের সময় প্রতি নৌকা থেকে গড়ে প্রায় ৩৫০ টাকা অতিরিক্ত চাঁদা হিসেবে আদায় করা হয়। একটি জেলে নৌকা প্রতি মাসে দুই গোণে অর্থাৎ দুইবার মাছ ধরে। বছরে গড়ে প্রতিটি নৌকা ১৮ বার মাছ সংগ্রহ করে থাকে। এই হিসাবে প্রতি বছর জেলে নৌকা হতে গড়ে প্রায় ২৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত আদায় করা হয়। (সারণি ৩.১৯)

এছাড়া জেলে নৌকাগুলো বন বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত সীমার বাইরে গেলে প্রতি টহল ফাঁড়িতে নৌকা প্রতি ১০০ টাকা অতিরিক্ত চাঁদা দিতে হয়। অন্যদিকে প্রায় সমসংখ্যক জেলে নৌকা পারমিট ছাড়াই সুন্দরবনে মাছ ধরতে আসে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে টহল ফাঁড়ি প্রতি ১২৫ টাকা ঘুষ দিতে হয়। এছাড়া প্রতি ট্রিপেই ডাকাত/বনদুস্যদেরকে নৌকা প্রতি গড়ে ২০০ টাকা দিতে হয়।

সুন্দরবনের সংরক্ষিত এলাকায় মৎস্য শিকার ও চিংড়ির পোনা আহরণ প্রক্রিয়ার দুর্নীতি সম্পর্কে একজন বন কর্মকর্তা জানান, জেলেরা পাস নিয়ে মাছ সংগ্রহ করে ফিরে আসার পর ওজনানুসারে ট্যাক্স দেয়, কিন্তু বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ট্যাক্সের রশিদ দেন না। বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ওজন কম দেখিয়ে সরকারি রেজিস্টারে কম ওজন লিপিবদ্ধ করে এবং অতিরিক্ত টাকা নিজেরা নিয়ে নেয়। অর্থাৎ গরীব জেলেরা যা ট্যাক্স দেয় সরকার তা পায় না।

দুবলা জেলে পল্লীতে রাজস্ব আদায়ে অনিয়ম

সুন্দরবনের দক্ষিণ-পশ্চিমে ৪৫ ও ৮ নম্বর কম্পার্টমেন্টে দুবলার চর অবস্থিত। এই এলাকার ১৩টি চর দুবলা জেলে পল্লী নামে পরিচিত। দুবলার কর্মকান্ড মূলত মৌসুমী মৎস্য আহরণভিত্তিক। দুবলার চরের কার্যক্রম সাধারণত প্রতিবছর অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চলে। এই সময়ে এখানে মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ কাজে প্রায় ২ লক্ষ লোক সম্পৃক্ত থাকে। দেশের চট্টগ্রাম, ফেনি, বরিশাল, বাগের হাট, কুতুবদিয়া এলাকা থেকে মাছ শিকারীরা মৌসুম শুরু হলেই চলে আসে। দুবলার চর থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার মন শুটকি মাছ উৎপন্ন হয়। বন বিভাগের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এখানে যে পরিমাণ মাছ শিকার করা হয় তার তিন ভাগের এক ভাগ রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে এবং বাকি দু'ভাগ চলে যায় ওই দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পকেটে।

জেলে পল্লীতে লোভনীয় পোস্টিং নিয়ে মৌসুমে কমপক্ষে বন বিভাগের ৪৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। বন মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে সকল দপ্তরে মোটা অঙ্কের ঘুষ প্রদান করে এই জেলে পল্লীতে বন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পোস্টিং নেয়। এটি বন বিভাগের রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস হলেও এখানকার প্রত্যেক বন কর্মকর্তা-কর্মচারী মৌসুমে (৬ মাস) ৫ থেকে ৬ লক্ষ টাকা অবৈধ আয় করে থাকে।

এখানে কবরখালী, ছোট আমবাড়িয়া, বড় আমবাড়িয়া, মানিকখালী, নারকেলবাড়ীয়া, মেহেরআলী, মাঝের কিল্লা, আলোরকোল এবং অফিস কিল্লার চরগুলিতে মৎস্য আহরণের জন্য জেলেরা রাজস্ব প্রদান করে থাকে। সরকার প্রতি বছর এ জেলে পল্লী থেকে কমপক্ষে এক কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বন বিভাগের এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তায় মৎস্য শিকারীদের মহাজনদের সাথে মোটা অঙ্কের আর্থিক চুক্তির বিনিময়ে বনের শেওলা, কটকা, কচিখালী, সুপতি, নিলকমল, দোবেকি, মান্দারবাড়িয়া, পুষ্পকাঠি, আলিবান্ধা, চরকি, তালবাড়িয়া অভয়ারণ্য এলাকায় মাছ শিকারের সুযোগ করে দেয়। নিষিদ্ধ এলাকাগুলোতেও নিয়মিত মৎস্য শিকারের ফলে মাছের প্রজনন ধ্বংস হতে চলেছে। অভয়ারণ্যের বিভিন্ন স্টেশন ও ফাঁড়িগুলোতে নৌকা প্রতি সপ্তাহে ২'শ থেকে ৩'শ টাকা উৎকোচ দিয়ে মাছ শিকার করে থাকে।

অনেক জেলে অতিরিক্ত মাছ সংগ্রহের লক্ষ্যে বনের অভ্যন্তরে নদী ও খালে বিষাক্ত সিমবুশ, রিপকট, ওস্তাদ প্রভৃতি কীটনাশক ছিটিয়ে চিংড়িসহ অন্যান্য প্রজাতির মাছ সংগ্রহ করতে যেয়ে মাছের ডিম ও পোনাসহ এর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে ইতোমধ্যে সুন্দরবনে মৎস্য শূণ্যতা দেখা দিয়েছে।

চিংড়ি পোনা শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে বন বিভাগ চিংড়ি পোনা ধরার জন্যে কোনো পাশ দেয় না। কিন্তু চিংড়ি পোনা আহরণ থেমে নেই। প্রতি সপ্তাহে চিংড়ি পোনা আহরণকারীকে নৌকা প্রতি ৪০ থেকে ৫০ টাকা উৎকোচ দিতে হয়। উৎকোচের টাকা বন বিভাগের স্টেশন অফিসগুলোর কর্মকর্তারা নেন। এর জন্য প্রতিটি স্টেশনে একাধিক আদায়কারীও রয়েছে।

নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও হাঙর শিকার অব্যাহত

বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭৩ অনুসারে হাঙর শিকার নিষিদ্ধ হলেও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্র উপকূলের বিভিন্ন চরে হাঙর শিকার করা হচ্ছে। এই হাঙর চোরাই পথে মায়ানমার ও ব্যংকক হয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও বিভিন্ন ইউরোপিয়ান দেশসমূহে পাচার করা হয়। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হওয়ায় প্রতিনিয়ত এই হাঙর শিকার বাড়ছে।

হাঙরের বিভিন্ন অংশ	বাজার মূল্য (প্রতি কেজি)	প্রস্তুতকৃত দ্রব্য
চামড়া	২৫০০ টাকা	অলংকারের বাক্স, মানিব্যাগ, মেয়েদের হাত ব্যাগ ও জুতা
চর্বি	৩০০০ টাকা	ওষুধ
পাখা	-	স্যুপ
দাঁত ও হাড়	-	বিভিন্ন অলংকার
অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ	-	মাছের ও পোলট্রি ফিড

ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মৌসুমে প্রায় ২০০০ জেলে ২৫০ ট্রলারে হাঙর শিকার করে থাকে। কুয়াকাটা, সোনার চর, ফাতরার চর, রূপের চর, পটুয়াখালীর চর গঙ্গামতি এবং আশার চর, বরগুনার পাথরঘাটা প্রভৃতি এলাকায় এই হাঙর শিকার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ চলছে। এ উদ্দেশ্যে এখানে প্রায় ৫০টি কেন্দ্রও গড়ে উঠেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে এই সকল কেন্দ্রে হাঙর প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে।

অনতিবিলম্বে হাঙর শিকার বন্ধ করা সম্ভব না হলে এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হবে।

সূত্র: দি ডেইলি স্টার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

পশ্চিম সুন্দরবন এলাকায় প্রতিদিন প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার মানুষ চিংড়ি পোনা আহরণ কাজে নিয়োজিত। পূর্ব সুন্দরবন অর্থাৎ শরণখোলা এবং চাঁদপাই রেঞ্জে পোনা আহরণকারী লোকের সংখ্যা ১০ সহস্রাধিক। এটি তাদের পেশা। কখনও বনের পার্শ্ববর্তী নদীতে, কখনও বনের মধ্যকার খাল ও নালায় চিংড়ি পোনা আহরণ করে। ঘন বুননের নাইলনের নেটে বেহুন্দি দিয়ে পোনা আহরণ করা হয়। এ বিষয়ে বন কর্মকর্তাদের ভাষ্য হচ্ছে, বনের বাইরে পোনা আহরণকারীদের বিরুদ্ধে আমরা কোনো পদক্ষেপ নিতে পারি না। এ বিষয়টি দেখার দায়িত্ব স্থানীয় প্রশাসনের।

৩.৫.৩ সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহে অনিয়মঃ

সুন্দরবনের অন্যতম সম্পদ মধু। সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল বাওয়ালী ও জেলেদের একাংশ বন বিভাগ নির্ধারিত সময়ে সুন্দরবন থেকে মধু সংগ্রহ করে। সাধারণত প্রতি বছর এপ্রিল মাসে মধুর পারমিট দেওয়া হয়। মধু সংগ্রহের জন্য গড়ে ১০ জন মৌয়ালের একটি দল একটি নৌকা নিয়ে সুন্দরবনে মধু সংগ্রহে যায়।

সারণি ৩.২০: বন বিভাগের হিসাব অনুসারে মধু ও রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ (২০০১-২০০৬)

আর্থিক সন	পারমিটের সংখ্যা	সংগ্রহের পরিমাণ (মণ)	রাজস্বের পরিমাণ (টাকা)
২০০১-২০০২	১৩৯	২,৩৩৫	৬,১৯,৬৫৫
২০০২-২০০৩	২১৪	৩,৪৭৪	৭,৫৭,৯৮৩
২০০৩-২০০৪	২২৫	৩,৩৫৪	৭,৫১,২০৩
২০০৪-২০০৫	২৫৩	৩,৯৬২	৮,৫৪,৪০০
২০০৫-২০০৬	২৫৩	৩,২২২	৭,১১,২২৫
গড়	**২১৭**	**৩,২৬৯**	**৭,৩৮,৮৯৩**

সূত্রঃ বন বিভাগ, ২০০৭

সাধারণত বনে মধু আনতে যাওয়ার সময় বন বিভাগের বিভিন্ন স্টেশনে মৌয়াল প্রতি ৫৫০ টাকা রাজস্ব দিতে হয়। এক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ফি মণপ্রতি মধুর জন্য ২০০ টাকা ও মণপ্রতি মোমের জন্য ৩০০ টাকা। প্রতিটি নৌকা একমাসে গড়ে ১৫ মণ মধু ও এক (১) মণ মোম সংগ্রহ করে থাকে। অন্যদিকে মধু সংগ্রহ করে ফিরে আসার সময় ঐ স্টেশনে নৌকা প্রতি প্রায় একমণ মধু ঘুষ হিসেবে দিতে হয়। পথিমধ্যে বনদস্যু বা ডাকাতদের সাথে দেখা হলে নৌকা প্রতি ৫-৭ কেজি মধু দিয়ে আসতে হয়।

সারণি ৩.২১: প্রতি বছর মধু সংগ্রহের ক্ষেত্রে বন বিভাগ কর্তৃক ঘুষ হিসেবে মধু গ্রহণের পরিমাণ

রেঞ্জ	নৌকার সংখ্যা	গড় মৌয়াল সংখ্যা	সংগ্রহকৃত মধুর গড় পরিমাণ (মণ)	সরকারি রাজস্ব (জন প্রতি ৫৫০ টাকা)	বন স্টেশন প্রতি ঘুষ হিসেবে মধু (নৌকাপ্রতি ১মণ)	বাজার মূল্য (প্রতি মণ ৫,০০০)
বুড়িগোয়ালিনী	৯০	৯০০	১৩৫০	৪,৯৫,০০০	৯০	৪,৫০,০০০
নলিয়ান	৬০	৬০০	৯০০	৩,৩০,০০০	৬০	৩,০০,০০০
শরণখোলা	২০	২০০	৩০০	১,১০,০০০	২০	১,০০,০০০
মোট	**১৭০**	**১,৭০০**	**২,৫৫০**	**৯,৩৫,০০০**	**১৭০**	**৮,৫০,০০০**

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, প্রতি বছর মৌয়ালদের নিকট থেকে বন বিভাগের কর্মকর্তারা প্রায় ৮ লক্ষ টাকার মধু উৎকোচ হিসেবে আদায় করে থাকে। এই মধু পরবর্তীতে প্রধান বন সংরক্ষক হতে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পর্যন্ত উপঢৌকন হিসেবে পাঠানো হয়।

৩.৬ সুন্দরবনে ডাকাতের উপদ্রব

সুন্দরবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে বনদস্যু বা ডাকাত। ছোট-বড় প্রায় ৩০টি ডাকাত দল সমগ্র সুন্দরবনকে দখল করে বন বিভাগের সমান্তরাল আরেকটি প্রশাসন গড়ে তুলেছে। এই ডাকাত দলকে চাঁদা না দিয়ে সুন্দরবন থেকে কোনো ধরনের বনজ সম্পদ আহরণ করা সম্ভব নয়।

সাধারণত দলপ্রধানের নামেই দলগুলো পরিচিত। প্রতিটি দলে ২৫-৩০ জন সদস্য থাকে। এদের প্রত্যেকের কাছেই থাকে আধুনিক অস্ত্র। ডাকাত দলগুলোর কাছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দ্রুতগামী ট্রলারও রয়েছে। প্রতিটি দল মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দ্রুত খবর আদান-প্রদান করে থাকে।

নিজেদের শক্তিমত্তা অনুসারে দলগুলো বনের নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা থেকে কোনো বনজ দ্রব্য যেমন গোলপাতা, গরান, মধু, কাঁকড়া, মাছ ইত্যাদি সংগ্রহ করার জন্য নির্দিষ্ট হারে চাঁদা দিতে হয়। এমনকি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা থেকে বনজ সম্পদ সংগ্রহ না করলেও, শুধুমাত্র এলাকার উপর দিয়ে যাতায়াতের জন্যও চাঁদা দিতে হয়। গোলপাতা, গরান বা মৌয়ালদের নৌকা সাধারণত নির্দিষ্ট কূপ থেকে বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করে ফিরে আসার পথে দুই বা তিনটি ডাকাত দলের সম্মুখীন হয় এবং তাদেরকে চাঁদা দিতে হয়। সাধারণত বাওয়ালী, মৌয়াল ও জেলেরা বনে প্রবেশের পূর্বেই ডাকাতদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

তবে প্রত্যাশিত সংখ্যার অধিক ডাকাত দলের মুখোমুখি হলে অথবা কোনো ডাকাতদলকে নির্দিষ্ট অর্থের বেশি প্রদান করতে বাধ্য হলে, সর্বশেষ ডাকাতদলের মোকাবেলায় বাওয়ালী বা জেলেদেরকে সমস্যায় পড়তে হয়। চাহিদা মোতাবেক চাঁদা প্রদানে ব্যর্থ হলে ডাকাতরা বাওয়ালী বা জেলেদের জিম্মি করে রাখে এবং নৌকায় লুটপাট চালায়। পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে জনপ্রতি গড়ে ৩০,০০০ টাকা মুক্তিপণ আদায় করে।

সারণি ৩.২২: ডাকাত দলপ্রতি চাঁদার পরিমাণ

ক্রমিক নং	বনজ দ্রব্যের ধরন	চাঁদার পরিমাণ
১	বাওয়ালী (নৌকা প্রতি)	৫০০০ টাকা
২	মৌয়াল (জন প্রতি)	১ কেজি মধু
৩	জেলে (নৌকা প্রতি)	২০০ টাকা

এছাড়া গভীর সমুদ্রে বড় বড় মাছ ধরা ট্রলারে ডাকাত দল সংঘবদ্ধ হামলা চালিয়ে লুটপাট করে। এক্ষেত্রে মাছের সাথে সাথে মাছ ধরার জাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এমনকি খাদ্যদ্রব্যও লুটপাট করে থাকে। অনেক সময় মাছ বা দাবিকৃত চাঁদা না পেয়ে জেলেদেরকে জিম্মি করে, ট্রলার ছিনিয়ে নেয় এবং পরবর্তীতে বহদ্দাদের নিকট হতে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে ট্রলার ও জেলেকে ছেড়ে দেয়। ডাকাত দলকে প্রতিরোধ করতে যেয়ে তাদের হামলায় অথবা মুক্তিপণ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রতি বছর গড়ে ১০ জন জেলে-বাওয়ালী প্রাণ হারায়।

সুন্দরবনের অভ্যন্তরে রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে বনজ সম্পদ সংগ্রহের সময় বনজীবীদের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব বন বিভাগ, কোস্ট গার্ড ও সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর। কিন্তু এদের সকলেই সুন্দরবনের ডাকাত প্রতিরোধে কার্যকর নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ। বন বিভাগ ও পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ডাকাত প্রতিরোধের পরিবর্তে ডাকাতদের সহায়তা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। বন বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, মালি, নৌকাচালক ও বনরক্ষী ডাকাতদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের খবর ডাকাতদের নিকট ফাঁস করে দিয়ে থাকে। এমনকি বন বিভাগের বনরক্ষীদের বিরুদ্ধে ডাকাতদের কাছে অস্ত্র ভাড়া দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

ডাকাত নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে বন বিভাগ লোকবলের অভাব, প্রয়োজনীয় অস্ত্রের অভাব, অস্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতা, যানবাহনের অভাব, নিয়মিত টহল ও বিশেষ অভিযানে প্রয়োজনীয় জ্বালানির অভাব এবং নিরাপত্তার অভাবের কথা উল্লেখ করে। বনের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বনরক্ষীদের বিভিন্ন ক্যাম্পে যে সকল অস্ত্র আছে তা অনেক পুরানো এবং অনেকাংশেই অকেজো। অস্ত্র চালনায় বন রক্ষীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দেওয়া হয় না। বনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্যাম্পে বিশাল এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে মাত্র ৩-৪ জন কর্মচারী থাকে। তাদের পক্ষে নিজের জিম্মায় থাকা অস্ত্রের নিরাপত্তা দেওয়াও সম্ভব হয় না। অনেক দুর্গম স্থানের ক্যাম্পে অনেক সময় নিরাপদ খাবার পানির জন্যও বন বিভাগের কর্মচারীদের ডাকাত দলের উপর নির্ভর করতে হয়।

কোস্টগার্ডও ডাকাত দল নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় অর্থ, অস্ত্র ও যানবাহন সংকটের কথা উল্লেখ করে। গভীর বনে অসংখ্য অগভীর নালা ও খালে দ্রুতগামী জলযানের অভাব রয়েছে। কোস্টগার্ড যেসব স্পিডবোটে করে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে সেই সকল বোটে গুলি লাগলেই আগুন ধরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। এছাড়া ডাকাত প্রতিরোধে অভিযানের সময় ডাকাতদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়। কেননা ডাকাত দলের সদস্যরাও সাধারণ জেলে বা বাওয়ালীর ছদ্মবেশে থাকে। তবে কোস্টগার্ড সদস্যদের বিরুদ্ধেও ডাকাত দলকে সহায়তা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ অভিযান পরিচালনার শুরুতেই কোস্টগার্ডের নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ডাকাত দলকে আগাম খবর দিয়ে সতর্ক করে দেয়।

ডাকাত দলের সদস্যরা গভীর বনে থাকলেও তাদের প্রতিনিধি এবং তাদের গডফাদাররা সুন্দরবন সংলগ্ন জেলা শহরেই থাকে। রাজনৈতিক ছত্রছায়া, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ মদদে এরা আইন প্রয়োগকারী বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করে বনে টিকে আছে। আধুনিক অস্ত্রের সরবরাহের জন্যও ডাকাতরা এই সকল গডফাদারদের উপর নির্ভর করে।

ডাকাত দলের অনেক গোলপাতা ও গরান ব্যবসায়ীদের সাথে গোপন সমঝোতা থাকে। সাধারণত এই সকল অর্থ বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ী বা মহাজনদের নিকট হতে ৭-৮ জন বাওয়ালীর একটা দল মূলধন সংগ্রহ করে গোলপাতা বা গরান সংগ্রহ করার জন্য বনে যায়। এক্ষেত্রে মহাজন মূলধনের সাথে সাথে মোট লাভের একটা সমান ভাগ পেয়ে থাকে। কিন্তু অনেক সময়ই এই মহাজন বা ব্যবসায়ী অতিরিক্ত কিছু লাভের আশায় কোনো ডাকাতদলকে তার নৌকার অবস্থান ও গতিপথ সম্পর্কে খবর দিয়ে দেয়। বিনিময়ে ডাকাতদল ঐ নৌকা থেকে প্রাপ্ত অর্থের অর্ধেক ব্যবসায়ীকে দিয়ে থাকে।

৩.৭ বন বিভাগে নিলাম প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট অনিয়ম

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন বিভাগ কর্তৃক প্রতিমাসে প্রয়োজনানুযায়ী এক বা একাধিকবার বনজ সম্পদ বিক্রয়ের জন্য নিলামের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত বিভিন্ন প্লান্টেশন এলাকায় অর্থাৎ সরকারি ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট বাগানের আবর্তন কাল পূর্ণ হওয়ার পর সরকারিভাবে নিলামে গাছ বিক্রি করা হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বনাঞ্চলেও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অধীনে নির্দিষ্ট সময় পর পর নির্দিষ্ট এলাকায় বাছাই কর্তনের মাধ্যমে গাছ বিক্রি এবং রাজস্ব আদায়ের নিয়ম রয়েছে। তবে বর্তমানে প্রাকৃতিক ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের গাছ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

অন্যদিকে বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও সরকার নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য বনাঞ্চলে বন বিভাগের নিয়মিত টহলের মাধ্যমে ও গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানে প্রচুর পরিমাণে চোরাই কাঠ উদ্ধার করা হয়। চোরাই কাঠ পাচারের সময়, ব্যবসার সময়, স'মিল বা ফার্নিচারের দোকানে ব্যবহারের সময় বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক আটক ও জব্দ হয়ে থাকে। এই সকল জব্দকৃত কাঠ পরবর্তীতে নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করে রাজস্ব আদায় করা হয়। এই নিলামের ক্ষেত্রেই বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। নিলামের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম নিম্নে আলোচনা করা হলো।

কাঠের গুণগত মান পরিবর্তন: বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবসায়ীর সাথে গোপন সমঝোতার মাধ্যমে নিলামের জন্য নির্দিষ্ট কাঠের তালিকা তৈরির সময় কাঠের গুনগতমান পরিবর্তন করে ভাল মানের ও দামি কাঠকে নিম্নমানের বা কম দামি কাঠ হিসেবে তালিকাবদ্ধ করে থাকেন। অনেক সময় সম্পূর্ণ ভাল কাঠকেও দীর্ঘদিন খোলা স্থানে পড়ে থাকার অজুহাতে জ্বালানি কাঠ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

প্রকৃত কাঠের পরিমাণ গোপন করা: ব্যবসায়ীর সাথে গোপন সমঝোতার মাধ্যমে নিলামের জন্য নির্দিষ্ট কাঠের পরিমাণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করে পরিমাণ কমিয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে নিলামের কাঠের সাথে নিলামের কাগজমূলে বাড়তি কাঠ বিক্রি করে দেওয়া হয়। এই বাড়তি কাঠের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী আত্মসাৎ করে থাকে।

নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সিন্ডিকেটকে নিলামে ডাক গ্রহণে সহায়তা প্রদান: অবৈধ আর্থিক সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে নিলামের ডাক গ্রহণে আগ্রহী নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সিন্ডিকেটকে বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন অজুহাতে বা তুচ্ছ কারণে অন্যদের দরপত্র বাতিল করা হয়। দরপত্র গ্রহণ ও জমাদানে অযৌক্তিকভাবে স্বল্প সময় প্রদান ও স্থান নির্ধারিত করে দেওয়া হয়, ফলে প্রভাবশালী মহল বা নির্দিষ্ট সিন্ডিকেট কর্তৃক অন্যান্য দরপত্র গ্রহণ ও জমাদান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। অন্যদের দর প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যবসায়ী বা সিন্ডিকেটকে সহায়তা করা হয়।

ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট গঠন: অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট গঠনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তার সহায়তায় গড় নিলাম মূল্য জেনে নিয়ে তার চেয়ে সামান্য বেশি দর দিয়ে নিলামে সকল কাঠ কিনে নেয়। পরবর্তীতে নিজেদের মধ্যে ঐ কাঠের পুনরায় নিলাম করা হয়। এক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায় সেটা সিন্ডিকেটের ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়।

৩.৮ বন মামলা সংক্রান্ত অনিয়ম

বন আইনের অধীনে বন বিভাগের কর্মকর্তা কর্তৃক এ সংক্রান্ত অপরাধীর বিরুদ্ধে তিন ধরনের মামলা করার বিধান রয়েছে। মামলার ধরনগুলি হচ্ছে প্রসিকিউশন অফেন্স রিপোর্ট (পিওআর), কম্পাউন্ডেবল অফেন্স রিপোর্ট (সিওআর) ও আন-ডিটেক্টেবল অফেন্স রিপোর্ট (ইউডিআর)। অপরাধের ধরন, স্থান ও গুরুত্ব অনুসারে বন কর্মকর্তা নির্দিষ্ট ধরনের মামলা করেন।

গুরুত্ব ও ধরনানুসারে অপরাধ নিস্পত্তিযোগ্য বিবেচিত হলে নির্দিষ্ট জরিমানা আদায়ের মাধ্যমে বন কর্মকর্তা নিজেই মামলার নিস্পত্তি করে থাকেন। এক্ষেত্রে বন কর্মকর্তাকে অবশ্যই রেঞ্জার বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদাসম্পন্ন হতে হবে। অপরাধীর নিকট জব্দযোগ্য কোনো বনজ দ্রব্য পাওয়া গেলে, তার প্রাক্কলিত মূল্য ও জরিমানা পরিশোধ সাপেক্ষে অপরাধী সেই দ্রব্য নিয়ে যেতে পারবে। এক্ষেত্রে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা ডিএফও সেই আটককৃত বনজ দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করবেন। এই ধরনের বন মামলা কম্পাউন্ডেবল অফেন্স রিপোর্ট (সিওআর) নামে পরিচিত। তবে বন আইন, ১৯২৭ এর বিভিন্ন ধারায় [২৬ (১এ), ৩৩ (১এ), ৬২ অথবা ৬৩] বর্ণিত নির্দিষ্ট ধরনের কিছু অপরাধ এই ধরনের মামলার মাধ্যমে বিবেচনা করা যাবে না।

কোনো ক্ষেত্রে অপরাধী সনাক্ত করা সম্ভব না হলে, অজ্ঞাতনামা আসামির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় এবং প্রাপ্ত বনজ দ্রব্য জব্দ করা হয়। এক্ষেত্রে মামলাটি আন-ডিটেক্টেবল অফেন্স রিপোর্ট (ইউডিআর) হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়।

মূলত উপরোক্ত দুই ধরনের মামলা ভিন্ন সকল মামলাই প্রসিকিউশন অফেন্স রিপোর্ট (পিওআর) হিসেবে পরিচিত। অর্থাৎ বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনাঞ্চলে সংঘটিত কোনো অপরাধের মাত্রা বেশি হলে বা বনজ সম্পদের পরিমাণ বেশি হলে অপরাধীকে গ্রেফতার ও বনজ সম্পদ জব্দ বা আটক করার পর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে চালান করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীর জামিন হলেও মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জব্দকৃত মালামাল বা বনজ সম্পদ আটক রাখা হয়। মামলায় অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধীকে জেল বা জরিমানা অথবা জেল ও জরিমানা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা হয় এবং আটককৃত বনজ সম্পদ নিলামে বিক্রি করা হয়।

বন আইনে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য মামলার ধরন সুনির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও কিছু দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-কর্মচারী মামলার ধরন পরিবর্তনের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করে থাকে। অপরাধীর সাথে গোপন সমঝোতার মাধ্যমে বন আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করে গুরুতর অপরাধকেও নিস্পত্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে লিপিবদ্ধ করে অর্থাৎ পিওআর মামলার পরিবর্তে সিওআর মামলা করে থাকে। ফলে অপরাধী বিনা শাস্তিতে মুক্তি পেয়ে যায় এবং যৎসামান্য জরিমানা আদায়ের মাধ্যমে অবৈধভাবে সংগ্রহকৃত বনজ দ্রব্য ছাড়িয়ে নিয়ে থাকে।

বন আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত বনাঞ্চল হতে অবৈধভাবে সংগৃহীত কাঠ সংশ্লিষ্ট অবৈধ বা চোরাই কাঠ ব্যবসায়ীদের নিকট সিওআর মামলায় নিস্পত্তির মাধ্যমে বিক্রি করার নিয়ম নেই। কিন্তু রাঙ্গামাটি সার্কেলে এইভাবে ২০০৫ সালে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ সিএফটি চোরাই কাঠ সংশ্লিষ্ট কাঠ ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করায় সরকারের প্রায় সাড়ে ২৭ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়। এই অনিয়মের সাথে বন বিভাগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংসদের স্থায়ী কমিটির জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। (সারণি ৩.২৩ দ্রষ্টব্য)

অনেক ক্ষেত্রে অবৈধ বনজদ্রব্য বা চোরাই পণ্যসহ আসামি ধরা পড়লেও বন কর্মকর্তা অবৈধ অর্থের বিনিময়ে পিওআর মামলার পরিবর্তে ইউডিআর মামলা করেন এবং আসামিকে ছেড়ে দিয়ে থাকেন।

কখনও কখনও চোরাই কাঠ ব্যবসায়ী সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কাঠ কেটে নিকটস্থ বন অফিসের কাছে জমা করে সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তাকে সেই চোরাই কাঠের সন্ধান দেয়। বন কর্মকর্তা সেই কাঠ সংগ্রহ করে ইউডিআর মামলা করে। পরবর্তীতে ঐ জব্দকৃত কাঠ নিলামে সেই চোরাই কাঠ ব্যবসায়ী কিনে নেয়। এভাবে অবৈধ কাঠ বৈধ করে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে অসাধু বন কর্মকর্তা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার সাথেই

জড়িত থাকেন এবং সংশ্লিষ্ট চোরাই কাঠ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অবৈধ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করেন। অন্যদিকে একই সাথে চোরাই কাঠ আটক ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্যও কৃতিত্ব দাবী করেন।

সারণি ৩.২৩: রাঙ্গামাটি সার্কেলে অবৈধভাবে সিওআর মামলায় নিষ্পত্তিকৃত কাঠের পরিমাণ ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ (২০০৫)

কাঠের ধরন	কাঠের পরিমাণ (সিএফটি)	রাজস্বের পরিমাণ (টাকা)	সিএফটি প্রতি দরপত্র মূল্য (টাকা)	সিএফটি প্রতি গড় নিলাম মূল্য (টাকা)	গড় নিলাম মূল্যে রাজস্ব পাওয়া যেতো (টাকা)	সরকারি রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ (টাকা)
সেগুন গোল	২১৩,২৯৯.৯৪	২৩,৬১৮,৬২৭.৯১	১১০.৭৩	৬০০	১২৭,৯৭৯,৯৬৪.০০	১০৪,৩৬১,৩৩৬.০৯
সেগুন রদ্দা	১৪৭,৩৮৩.৫০	৩১,১৬৫,৪৮৬.০৮	২১১.৪৬	১,০০০	১৪৭,৩৮৩,৫০০.০০	১১৬,২১৮,০১৩.৯২
বিবিধ গোল	৮৫,৩২৪.০১	৮,৮৩৮,৮১৮.৪৮	১০৩.৫৯	২৫০	২১,৩৩১,০০২.৫০	১২,৪৯২,১৮৪.০২
বিবিধ রদ্দা	২০১,১৭৩.৫৩	৪০,৩০২,০৫৯.৯৯	২০০.৩৩	৪০০	৮০,৪৬৯,৪১২.০০	৪০,১৬৭,৩৫২.০১
	৬৪৭,১৮০.৯৮	**১০,৩৯,২৪,৯৯২.৪৬**			**৩৭,৭১,৬৩,৮৭৮.৫০**	**২৭,৩২,৩৮,৮৮৬.০৪**

সূত্র: রাঙ্গামাটি বন বিভাগ, ২০০৭।

বন আইনানুসারে বন মামলা দায়ের ও অপরাধ প্রমাণে বন কর্মকর্তার সাক্ষ্য যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। অসাধু বন কর্মকর্তা এই আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের এবং মামলার হুমকি দিয়ে অবৈধ আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। অনেক সময় বন থেকে কাঠ বা বনজ দ্রব্য চুরি হলে বা কোথাও বন অপরাধ সংঘটিত হলে বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী অফিসের ফাইল পত্র ঘেঁটে অফিসে বসেই পূর্বের তালিকাভুক্ত দরিদ্র চোর বা স্থানীয় কোনো ব্যক্তির নামে নতুন মামলা দায়ের করে। অর্থাৎ একবার কারও নাম বন বিভাগের চোরের তালিকায় লিপিবদ্ধ হলে, পুনরায় অপরাধ না করলেও রেকর্ড পত্রের সূত্র ধরে তার নামে একাধিক মামলা করা হয়। অন্যদিকে মামলার খরচ বহন করার জন্যই সেই দরিদ্র ব্যক্তিটিও পুনরায় কাঠ চুরি করতে বাধ্য হয়। টাঙ্গাইল বন বিভাগ সংলগ্ন এলাকার অনেক আদিবাসীর বিরুদ্ধে ৮০-৯০টি মামলারও দৃষ্টান্ত রয়েছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেয়ায় মাত্র দেড় বছরে বন মামলার সংখ্যা ৭২৫২ হতে ১৫০ এ কমে এসেছে।[৬৬]

আদালতে বন বিভাগের পক্ষ থেকে বন মামলা পরিচালক (ডেপুটি রেঞ্জার) বাদি হিসেবে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। অনেক অসাধু বন মামলা পরিচালক আসামি পক্ষ থেকে অবৈধ আর্থিক সুবিধা গ্রহণের বিনিময়ে সাক্ষ্য ও আলামত নষ্ট করে থাকে।

বন মামলা দায়ের ও পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুর্নীতি ও অনিয়ম করার পাশাপাশি বন বিভাগের বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতাও এক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা এবং দুর্নীতির অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। বন বিভাগের কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত বন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক বন আইন ও বন মামলার অপব্যবহারের কারণে সর্বত্র বন বিভাগের একটি নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বন বিভাগের কোনো সৎ কর্মকর্তা প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে সঠিক নিয়মে মামলা করলেও প্রশ্নের সম্মুখীন হন। মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলার আশংকায় প্রকৃত অপরাধীকে জামিন দেয়া এবং কখনও কখনও চূড়ান্ত বিচারের রায় দেয়ার ক্ষেত্রে আদালত অপরাধীর পক্ষে প্রভাবিত হয়ে পড়েন। যার ফলে দেখা যায়, প্রভাবশালী আসামি সহজেই জামিনে মুক্ত হয়ে পুনরায় বন অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। অনেক সময় জামিনে মুক্ত আসামি সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তাকে মামলা প্রত্যাহারের জন্য হুমকিও দিয়ে থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে চোরাই পণ্যসহ যানবাহন আটক করার পরও আদালতের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট যানবাহন ছেড়ে দিতে হয়। আদালতে যানবাহনের মালিক না জেনে চোরাই পণ্যের ব্যবসায়ীর কাছে যানবাহন ভাড়া দেওয়ার কথা জানান। অনেক ক্ষেত্রে যানবাহন হারিয়ে যাওয়ার গল্প তৈরি করেন। এমনকি বন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হয়রানি ও চাঁদাবাজির মিথ্যা অভিযোগ করেন। ফলে আদালত মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বেই যানবাহন মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

উল্লেখযোগ্য পরিমানে বনাঞ্চল রয়েছে এমন অনেক জেলা শহরে বন আদালত নেই। বন আইনে অভিজ্ঞ বন মামলা পরিচালকেরও অভাব রয়েছে। ফলে যথোপযুক্ত প্রমাণ ও সাক্ষ্য প্রদানের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই বন অপরাধী সহজে ছাড়া পেয়ে যায় অথবা আসামির অপরাধ প্রমাণ করা সম্ভব হয় না।

সারণি ৩.২৪: সারাদেশে ধরন অনুযায়ী অনিষ্পত্তিকৃত বন মামলার সংখ্যা

মামলার ধরন	পিওআর	সিওআর	ইউডিওআর
মামলার সংখ্যা	৬১,৩০৪	১১৮	৩,০৫৬

সূত্র: বন বিভাগ, মার্চ ২০০৮

[৬৬] S.Rizwana.Hasan, 'Conservative Forest Act Cannot Conserve Forests', *The Daily Star*, June 7, 2008.

বন বিভাগের অধিকাংশ পিওআর মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা একটা বড় সমস্যা। এই দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত আসামি বা অপরাধী বিনা শাস্তিতে ছাড়া পেয়ে যায়। অন্যদিকে একই কারণে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিও হয়রানির শিকার হয়। বন কর্মকর্তা বা কর্মচারী দূরে বদলি হয়ে যাওয়ার পর পূর্বের কর্মস্থলে যেয়ে সবসময় বিভিন্ন মামলার সাক্ষ্য দেয়া বা মামলার কার্যক্রমের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে সহায়তা করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভ্রমণ ভাতাও দেওয়া হয় না। অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীই বছরের পর বছর ধরে ভ্রমণ ভাতা পান না।

মামলা দায়ের ও পরিচালনার জন্য অথবা কোনো মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য আইনজীবি নিয়োগে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দও থাকে না। আসামিকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য খরচও বন বিভাগ থেকে বহন করা হয় না। কিন্তু সংঘটিত বন অপরাধ ও সংশ্লিষ্ট বন অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার সকল দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা-কর্মচারীকেই বহন করতে হয়। পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাবে এসব ক্ষেত্রে বন বিভাগের উচ্চপর্যায় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক কোন নির্দেশনা না দিয়ে মৌখিক পরামর্শের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে 'ম্যানেজ' করার জন্য বলা হয়। এই ম্যানেজ করার প্রক্রিয়া থেকেই দুর্নীতির উদ্ভব।

৩.৯ বন বিভাগে নিয়োগ, পদায়ন (পোস্টিং) এবং বদলিতে অনিয়ম

বন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে প্রধান বন সংরক্ষক (সিসিএফ)। এই পদটি অতিরিক্ত সচিবের সমমর্যাদা সম্পন্ন। প্রধান বন সংরক্ষক বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংশ্লিষ্ট সচিব এবং মন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হন।

পদানুসারে নিয়োগ প্রক্রিয়া ও নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ: বন বিভাগে ক্যাডারভুক্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পর্যায়ে সর্বনিম্ন বা এন্ট্রি পদ হচ্ছে সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ)। বন বিভাগ হতে প্রেরিত চাহিদার ভিত্তিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে এসিএফ পদে নিয়োগ দিয়ে থাকে।

অন্যদিকে সাব-অর্ডিনেট সার্ভিসের অধীনে নন গেজেটেড বা নন ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে রেঞ্জার, ডেপুটি রেঞ্জার ও ফরেস্টর- মোট তিনটি পদ রয়েছে। সম্প্রতি রেঞ্জার পদকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্তমানে চিটাগং ফরেস্ট্রি স্কুল থেকে 'ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি' ডিগ্রি গ্রহণকারীদের মধ্য হতে নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে 'ফরেস্টর' পদে নিয়োগ দেয়া হয়। সিসিএফের তত্ত্বাবধানে এই সকল পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। বন বিভাগে সর্বকনিষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তা হচ্ছেন বনরক্ষী। বনরক্ষীসহ বনমালী, নৌকাচালক, পিয়ন ও অন্যান্য চর্তুথ শ্রেণীর পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন বিভিন্ন বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও)।

পদোন্নতির নিয়ম: বন বিভাগে সাধারণত অন্যান্য সরকারি বিভাগের মতোই চাকরির বয়স ও যোগ্যতা প্রদর্শনের ভিত্তিতে পদোন্নতি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একজন বনরক্ষী পদোন্নতির মাধ্যমে ফরেস্টর পর্যন্ত, একজন ফরেস্টর পদোন্নতির মাধ্যমে এসিএফ পর্যন্ত পদোন্নতি পেয়ে থাকেন। সাধারণত শূন্য পদের এক-তৃতীয়াংশ পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়।

বদলির নিয়ম: সরকারি চাকরির অন্যতম অবশ্যম্ভাবী নিয়ম হচ্ছে বদলি। ২০০৪ সালে গৃহীত বদলি নীতিমালা অনুযায়ী বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ একই বিভাগে সর্বোচ্চ তিন (৩) বছর এবং একই সার্কেলে সর্বোচ্চ ছয় (৬) বছর কর্মরত থাকতে পারবেন। তবে বন বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সার্কেলের বাইরে বদলি না করার নীতি অনুসরণ করা হয়।

নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত অনিয়মসমূহ: বন বিভাগের অনিয়মসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর অনিয়ম হয়ে থাকে এই নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলিকে কেন্দ্র করে। অনেক বন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মতে, বন বিভাগের সকল দুর্নীতির মূলে রয়েছে এই বদলি বাণিজ্য। কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বিপুল অংকের ঘুষ দিয়ে তার কাঙ্ক্ষিত স্থানে বদলি হওয়ার পর সে ঐ পরিমানের চেয়ে আরও বেশি টাকা অবৈধ উপায়ে সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ঘুষের টাকাকে অবৈধভাবে, দ্রুত ও সহজে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য বিনিয়োগ হিসেবে মনে করে। যেসব প্রক্রিয়ায় এক্ষেত্রে অনিয়ম হয়ে থাকে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

> খুলনা সার্কেলে সবচেয়ে লোভনীয় পোস্টিংয়ের স্থান হচ্ছে দুবলা জেলে পল্লী। এখানে মাছ ধরার মৌসুমে প্রতিবছর প্রায় ২ কোটি টাকার লেনদেন হয়। অথচ সরকারি রাজস্ব দেখানো হয় সর্বোচ্চ ৪০ লক্ষ টাকা। বাকি প্রায় ১.৫ কোটি টাকা সংশ্লিষ্ট স্টেশনের ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজেদের মধ্যে এবং বন মন্ত্রণালয় পর্যন্ত ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে থাকে। এই স্টেশনের স্টেশন কর্মকর্তা হিসেবে পোস্টিং পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ২৫ লক্ষ টাকা ঘুষের প্রয়োজন হয়। এই পোস্টের পোস্টিং নিয়ন্ত্রণ হয় মন্ত্রণালয় হতে। এক্ষেত্রে মন্ত্রী ১০লক্ষ টাকা, প্রধান বন সংরক্ষক ৫ লক্ষ টাকা, বন সংরক্ষক ৩ লক্ষ টাকা এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ১ লক্ষ টাকা পেয়ে থাকে। এছাড়াও প্রতি মাসে মাসিক চাঁদা হিসেবে ৫০ হাজার টাকা এই স্টেশন থেকে সংগ্রহ করে খুলনা সার্কেল অফিসে পাঠানো হয়, যা বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়।
>
> সূত্র: সাক্ষাৎকার, বন কর্মকর্তা, খুলনা বন বিভাগ।

অর্থের বিনিময়ে লোভনীয় স্থানে বদলি: বন বিভাগের যেসব গুরুত্বপূর্ণ সার্কেল ও বিভাগীয় কার্যালয়, স্টেশন, ক্যাম্প ও চেকপোস্টে সহজে ও দ্রুত অবৈধ অর্থ সংগ্রহের সুযোগ আছে, সেই সকল স্থান বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট অত্যন্ত লোভনীয় পোস্ট হিসেবে বিবেচিত। যে কোনো অংকের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে এই সকল স্থানে পোস্টিং নিতে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারী উদ্গ্রীব থাকেন। এই সকল স্থানের বদলি বাণিজ্যের সাথে বন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হতে শুরু করে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত জড়িত থাকে। বদলি সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

অর্থের বিনিময়ে নিয়মিত বদলি আদেশ স্থগিত বা প্রত্যাহার: অনেক বন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ম-বহির্ভূতভাবে একই স্থানে তিন বছরের বেশি সময় কর্মরত থাকেন। এক্ষেত্রেও বন বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও মন্ত্রণালয়কে অবৈধ অর্থের বিনিময়ে 'ম্যানেজ' করেই থাকতে হয়। অনেক সময় ডিএফও বা সিএফের বদলির সুপারিশ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে প্রত্যাহার করে নিতে হয়।

লোভনীয় স্থান হতে বদলি হয়ে অন্য লোভনীয় স্থানে পোস্টিং: কোনো কোনো বন কর্মকর্তা-কর্মচারী এক লোভনীয় স্থানে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর তদবিরের মাধ্যমে ভিন্ন সার্কেলের অন্য কোনো লোভনীয় স্থানেই পুনরায় পোস্টিং আদায় করে নেন। বন বিভাগের সবচেয়ে লোভনীয় সার্কেল হচ্ছে সুন্দরবন বা খুলনা সার্কেল, রাঙ্গামাটি সার্কেল, চিটাগং সার্কেল এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় সার্কেলের অধীনে সিলেট ও টাঙ্গাইল বন বিভাগ। প্রায় সকল লোভনীয় বিভাগীয় কার্যালয়, রেঞ্জ, চেকপোস্ট ও ক্যাম্প এই সার্কেলগুলোর মধ্যেই অবস্থিত। বন বিভাগের মধ্যে একদল সুবিধাভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের কর্মজীবনের সম্পুর্ণ সময় এই সার্কেলগুলোর কোন না কোনটাতেই কর্মরত ছিলেন। অন্যদিকে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী এই সার্কেলগুলোর বাইরে যশোর, বগুড়া, রাজশাহী বা অন্য কোনো অঞ্চলে কাজ করেছেন, তারা কখনও উল্লিখিত লোভনীয় স্থানে বদলি হয়ে আসতে পারেননি।

সারণি ৩.২৫: বিভিন্ন সার্কেলে পোস্টিং নিতে বা বদলির জন্য ঘুষের পরিমাণ

পদের নাম	খুলনা সার্কেল	পদের নাম	চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি সার্কেল	পদের নাম	সিলেট সার্কেল
বন সংরক্ষক	২০ লক্ষ	বন সংরক্ষক	৫০ লক্ষ	বন সংরক্ষক	-
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উপ-বন সংরক্ষক)	২৫ লক্ষ	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উপ-বন সংরক্ষক)	৩০ লক্ষ	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উপ-বন সংরক্ষক)	৩০ লক্ষ
সহকারি বন সংরক্ষক (রেঞ্জ কর্মকর্তা)	১০ লক্ষ	সহকারি বন সংরক্ষক	৫ লক্ষ	সহকারি বন সংরক্ষক	৪ লক্ষ
রেঞ্জার (স্টেশন কর্মকর্তা/ কুপ কর্মকর্তা)	৪ লক্ষ	রেঞ্জার (রেঞ্জ কর্মকর্তা/ স্টেশন কর্মকর্তা)	১০ লক্ষ	রেঞ্জার (রেঞ্জ কর্মকর্তা)	৮ লক্ষ
ডেপুটি রেঞ্জার (স্টেশন কর্মকর্তা/ বিট কর্মকর্তা)	২ লক্ষ	ডেপুটি রেঞ্জার (স্টেশন কর্মকর্তা/ বিট কর্মকর্তা)	৫ লক্ষ	ডেপুটি রেঞ্জার (স্টেশন কর্মকর্তা/ বিট কর্মকর্তা)	৩ লক্ষ
ফরেস্টার (ক্যাম্প কর্মকর্তা)	১ লক্ষ	ফরেস্টার (বিট কর্মকর্তা)	২ লক্ষ	ফরেস্টার (বিট কর্মকর্তা)	২ লক্ষ
বন প্রহরী	৪০ হাজার	বন প্রহরী	৫০ হাজার	বন প্রহরী	৩০ হাজার
নৌকা চালক/ বনমালি	৩০ হাজার	নৌকা চালক/ বনমালি	২৫ হাজার	নৌকা চালক/ বনমালি	২০ হাজার

দুর্গম স্থানে বদলির ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায়: বন বিভাগের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা অনেক সময় দুর্গম ও দূরবর্তী কোনো স্থানে অথবা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বদলির ভয় দেখিয়ে তাদের অধস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট হতে চাঁদা আদায় করে থাকেন। সাধারণত নির্বাচনের আগে মন্ত্রীর বাড়তি চাহিদা পূরণের জন্য অথবা সিসিএফ বা সিএফের বিভিন্ন মৌসুমী চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে এ ধরনের চাঁদাবাজি করা হয়।

সাধারণ বদলির সুপারিশের জন্য চাঁদা আদায়: বর্তমানে সাধারণ কোনো বদলির জন্য অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সুবিধার জন্যও কেউ যদি বদলির সুপারিশ বা অনুমতি চান, সেক্ষেত্রেও তাকে ঘুষ দিতে হয়। বন বিভাগের উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তারা যেকোনও সুযোগে অবৈধ অর্থ আদায়ের চেষ্টা করে থাকেন।

নিয়োগে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা: বন বিভাগে নিয়োগকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন থেকে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮৪ সাল হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ষোল বছর বন বিভাগের ক্যাডার পদে নিয়োগ বন্ধ থাকায় বন বিভাগে যোগ্য কর্মকর্তার সংকট রয়েছে। কোনো সরকারি বিভাগে দীর্ঘ ষোল বছর প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা পর্যায়ে নিয়োগ বন্ধ থাকলে সমস্ত বিভাগের কার্যক্রমে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। বন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গুরুত্ব না

দেওয়ায়, রেঞ্জারদের দায়েরকৃত এ সংক্রান্ত এক মামলা দীর্ঘদিন যাবত অনিষ্পত্তিকৃত অবস্থায় ছিল। পরবর্তীতে ২০০০ সালে হাইকোর্ট থেকে এই মামলা খারিজ করে দেওয়া হয়।

<u>চলতি দায়িত্ব ও একাধিক দায়িত্ব পালন:</u> দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মকর্তা পর্যায়ে নিয়োগ বন্ধ থাকার কারণে বর্তমানে বন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা সংকট দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্মকর্তাদেরকে চলতি দায়িত্ব এবং একই সাথে একাধিক দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে সম্প্রতি **২১** জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ায় এই সংকট আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে বন বিভাগে প্রায় ৪০ জন কর্মকর্তা চলতি দ্বায়িত্বে রয়েছেন।

সারণি ৩.২৬: বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার সংখ্যা

শ্রেণী বা পদবী	সংখ্যা	%
১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২১	৮
রেঞ্জ অফিসার	৬৯	৩.৫০
ডেপুটি রেঞ্জ অফিসার	৪০	
ফরেস্টর	৬৬	
নৌকা চালক	৫৫	
অন্যান্য	৬৮	
মোট	**৩১৯**	**৩.৭০**

সূত্র: বন বিভাগ, মার্চ ২০০৮।

সারণি ৩.২৭: বন বিভাগে শূন্য পদের সংখ্যা

শ্রেণী বা পদবী		সংখ্যা	%
১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	সিসিএফ	১	
	ডিসিসিএফ	২	
	সিএফ	৭	
	ডিসিএফ	২৪	
	এসিএফ	৯	
	মোট	৪৩	১৭
২য়-৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী		৪৫০	৫
মোট শূন্য পদের সংখ্যা		**৪৯৩**	**৬**

সূত্র: বন বিভাগ, মার্চ ২০০৮।

১৯৯৭ সালের পর থেকে বন বিভাগের সিসিএফ পদে সকলেই চলতি দায়িত্বে ছিলেন। অর্থাৎ গত প্রায় দশ বছরের বেশি সময় ধরে কেউ পূর্ণাঙ্গ সিসিএফ পদে পদোন্নতি পাননি। সকলেই চলতি দায়িত্ব পালন করেই অবসর গ্রহণ করেছেন। পদোন্নতি না পাওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পদে ন্যূনতম তিন বছর দায়িত্ব পালনের নিয়মতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতার কারণেই এসমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই চলতি দ্বায়িত্বে তিন বছরের অধিক দায়িত্ব পালনের উদাহরণ আছে।

<u>পদোন্নতিতে অনিয়ম:</u> বন বিভাগের যে কোনো পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে সাধারণত জ্যেষ্ঠতা ও পূর্ববর্তী পদে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হয়। তবে সিসিএফ পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিভাগের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ তিনজনের প্যানেল থেকে সকল ধরনের বন বিভাগে কাজের অভিজ্ঞতা ও পূর্ববর্তী কর্মজীবনের রেকর্ড বিচার করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যেকোনো একজনকে সিসিএফ পদে নিয়োগ দিতে পারে। কিন্তু গত ২০-২৫ বছর ধরেই এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে। বিগত সময়ে প্রায় নিয়মিতভাবেই এই পদটিকে নিলামে তোলা হয়েছে। প্রথম তিনজনের প্যানেলের বাইরে থেকে জ্যেষ্ঠতার বিচারে পঞ্চম জনকেও এই পদে পদায়নের নজির আছে। সর্বশেষ পদচ্যুত সিসিএফকে এই পদের জন্য এক কোটি দশ লক্ষ টাকা দিতে হয়েছিল। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ছাড়াও সরকারের নীতি নির্ধারণী মহল জড়িত ছিল।

বন বিভাগের সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ ও পদায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি সমগ্র বন বিভাগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নির্দিষ্ট অংকের টাকা বিনিয়োগ করার মাধ্যমে সিসিএফ পদে নিয়োগ পাওয়ায়, পরবর্তীতে বন বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির সুপারিশের জন্যও অবৈধ আর্থিক সুবিধা বা চাঁদা দাবি করেন।

এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্প থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রেও অনিয়ম ও ঘুষ বাণিজ্য হয়ে থাকে। ফরেস্ট্রি রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (এফআরএমপি) থেকে ৬৪ জন এসিএফকে ২০০০ সালে রাজস্ব বিভাগে স্থানান্তর করা হলেও, দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের ক্যাডারভুক্ত করার বিষয়টির সন্তোষজনক সমাধান ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে মিথ্যা আশ্বাসে তাদের নিকট হতে চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে।

৩.১০ প্রকল্প সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি:

বন বিভাগে অনিয়ম ও দুর্নীতির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন। বিদেশি বিভিন্ন দাতা সংস্থা হতে অনুদান ও ঋণ হিসেবে প্রাপ্ত আর্থিক বরাদ্দে বন বিভাগ বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। এই প্রকল্পসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ হয় বন সম্প্রসারণ ও সামাজিক বনায়ন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে। এছাড়া বিভিন্ন সময় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প, সুন্দরবন বাঘ প্রকল্প নামক অন্যান্য প্রকল্প বন বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

সাধারণত প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বেই বা অনুমোদিত হওয়ার সাথে সাথে মোট বাজেটের একটা নির্ধারিত অংশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ঘুষ হিসেবে দিতে হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি স্তরে আর্থিক অনিয়ম হয়ে থাকে। চারা উন্নয়ন, বৃক্ষ রোপণ ও বনায়ন সংক্রান্ত প্রকল্পে সংঘটিত আর্থিক অনিয়মের ধরনসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

<u>জৈবসার বা গোবর এবং মাটি ক্রয়ে অনিয়ম:</u> বন বিভাগ বন সম্প্রসারণ ও বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত প্রকল্পে প্রয়োজনীয় চারা সাধারণত বিভাগীয় উদ্যোগে নিজেই তৈরি করে। চারা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জৈবসার বা গোবর এবং উর্বর ভিটা মাটি, যা বন বিভাগ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ক্রয় করে থাকে। এই ক্রয়ের ক্ষেত্রেই আর্থিক অনিয়ম হয়ে থাকে।

সাধারণত এক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয় গোপন করে বর্ধিত ব্যয় দেখানো হয় এবং পরিমাণে বেশি দেখানো হয়। এডিবি'র অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্পের অডিট রিপোর্টে অবাস্তব মূল্যে অস্তিত্বহীন বিক্রেতার কাছ থেকে গোবর বা জৈবসার ক্রয় সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে।

চারার মূল্যায়ন, পরিবহণ ও সংরক্ষণে অনিয়ম: কোনো ক্ষেত্রে বন বিভাগ প্রয়োজনীয় চারা উৎপন্ন করতে সমর্থ না হলে দরপত্রের মাধ্যমে চারা ক্রয় করে থাকে। এক্ষেত্রেও চারার প্রকৃত মূল্য গোপন করে বর্ধিত হারে দেখানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারা ক্রয় ও রোপণ না করে কম সংখ্যায় রোপণ করা হয় এবং বাকি অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। এছাড়া চারা পরিবহনেও প্রকৃত ব্যয় গোপন করা হয় এবং সংরক্ষণে অনিয়ম করা হয়। চটের ব্যাগের স্থলে পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহারের মাধ্যমে এক্ষেত্রে বরাদ্দ অর্থের শতকরা ১০ ভাগ খরচ করার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

সামাজিক বনায়নে অংশীদার নির্বাচনে অনিয়ম: সামাজিক বনায়নে অংশীদার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও অনিয়ম হয়ে থাকে। নিয়মানুসারে স্থানীয় বা নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী সামাজিক বনায়নে অংশীদার হিসেবে নির্বাচিত হবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও অনিয়মের কারণে অবৈধ আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ বা তার প্রতিনিধি এবং কখনও কখনও বহিরাগতরা অংশীদার হিসেবে নির্বাচিত হয়। এমনকি প্রভাবশালী রাজনৈতিক মহলের চাপে প্রকল্পের শেষ দিকেও অংশীদারের তালিকা পরিবর্তন করার উদাহরণ আছে। এছাড়া দরিদ্র অংশীদারদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্যও প্রত্যেকের কাছ হতে সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা নির্দিষ্ট হারে চাঁদা আদায় করেন।

অবকাঠামো নির্মাণ, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জাম ও যানবাহন ক্রয়ে অনিয়ম: বন বিভাগের অনেক উন্নয়ন প্রকল্পে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে সরকারি নিয়মানুসারে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও ঠিকাদার নিয়োগে, দরপত্র আহবানে এবং নির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে আর্থিক অনিয়ম হয়ে থাকে।

এছাড়া প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার ও ইলেক্ট্রনিকস সামগ্রী, আসবাবপত্র প্রভৃতি ক্রয়ের ক্ষেত্রেও অনিয়ম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নিম্নমানের সামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

ক্রয় সংক্রান্ত অনিয়মের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধরনের অনিয়ম হয়ে থাকে প্রকল্পের যানবাহন ও জ্বালানি ক্রয়ের ক্ষেত্রে। বৃহৎ অংকের আর্থিক লেনদেন জড়িত থাকায় আর্থিক অনিয়মের সুযোগও এখানে বেশি থাকে। দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়ায় পূর্ব থেকে গোপন সমঝোতার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয়ের মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য গোপন করে আর্থিক অনিয়ম করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের যানবাহন প্রকল্প বহির্ভূত কাজে ও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের মাধ্যমেও অনিয়ম করা হয়। অনেক সময় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রকল্পের জন্য ক্রয়কৃত যানবাহন বন বিভাগের এবং কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে। এমনকি প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রকল্পের যানবাহন সরকারি পুলে জমা দেয়ার নিয়ম থাকলেও অনেক সময়ই তা করা হয় না।

সংঘটিত সব ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্রেই বন বিভাগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা হতে সকল স্তরের কর্মকর্তা জড়িত থাকে। ফলে দুর্নীতি ও অনিয়মের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পাদনে কোথাও কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না।

কনসালটেন্ট ফার্ম ও কনসালটেন্ট নিয়োগে অনিয়ম: নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত বাজেটের প্রকল্পে নিয়মানুযায়ী কনসালটেন্ট ফার্ম বা কনসালটেন্ট নিয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রেও দরপত্র আহবান ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অবৈধ আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে বন বিভাগের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা হতে শুরু করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা জড়িত থাকে।

কনসালটেন্টদের প্রতিবেদন গ্রহণে অনিয়ম: প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে কনসালটেন্ট কর্তৃক প্রদেয় কারিগরি প্রতিবেদন গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও অনিয়ম হয়ে থাকে। আর্থিক দুর্নীতির মাধ্যমে নিম্নমানের প্রতিবেদন গ্রহণ করা হয়। আবার আর্থিক সুবিধা ব্যতীত যথার্থ প্রতিবেদনও গ্রহণ করা হয় না। অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালকের সহযোগিতায় প্রতিবেদন জমা না দিয়েই অনেক কনসালটেন্ট বরাদ্দ অর্থ আত্মসাৎ করে থাকেন।

প্রকল্প মূল্যায়ন ও অডিট দলের প্রতিবেদন প্রদানে অনিয়ম: প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) ও অডিট দল প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রতিবেদন তৈরি করে ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জমা দেয়। এক্ষেত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি ও সুষ্ঠ বাস্ত বায়ন হচ্ছে এ মর্মে এবং সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার পক্ষে প্রতিবেদন তৈরিতে ঘুষ দিতে হয়, অন্যথায় নেতিবাচক প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ ও আর্থিক বরাদ্দ স্থগিত এমনকি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবৈধ আর্থিক লেনদেন ছাড়াও প্রকল্প পরিদর্শনের সময় পরিদর্শকদের জন্য মাত্রাতিরিক্ত আপ্যায়ন ও উপহার সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হয়। পরিদর্শক দল ছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, সচিব ও বন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের সময় তাদের জন্যও আপ্যায়ন ও উপহার সামগ্রির ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু বাজেটে এ সংক্রান্ত কোনো বরাদ্দ থাকে না। ফলে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থাৎ অন্য খাতের অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমেই এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পে অনিয়ম

দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগে প্রায় চার'শ কোটি টাকার সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৮ সনের নভেম্বর মাসে অনুমোদিত ও ১৯৯৯ সনের আগস্ট মাস হতে কার্যকর ৭ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের মোট বাজেট ছিল ৭৭.৭ মিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে এডিবি'র ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৩.৭ মিলিয়ন ডলার। প্রকল্প অর্থের অন্যান্য উৎসের মধ্যে রয়েছে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি, নেদারল্যান্ড সরকার, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল।[৬৭]

প্রকল্প বন্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে এডিবি বন বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নে অতিরিক্ত শ্লথগতি ও আর্থিক অব্যবস্থাপনাকে দায়ী করে। এডিবি'র অভিযোগ অনুযায়ী প্রকল্পের অর্ধেক সময় অতিক্রান্ত হলেও প্রকল্পের এক-চতুর্থাংশ কাজ সম্পন্ন হয় এবং মাত্র ২৩% অর্থ সরবরাহ করা হয়।[৬৮] প্রকল্পের অপারেশন মূল্যায়ন মিশন (Operation Evaluation Mission) কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনে প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় এডিবির আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন উল্লেখ করা হয়। প্রকল্প চলাকালীন পর পর তিন বছর প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সরকারি মহা নিরীক্ষক কর্তৃক গুরুতর অডিট আপত্তি ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ করা হয়। এক্ষেত্রে আর্থিক হিসাব সংরক্ষণে অনিয়ম, দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদানে গুরুতর অনিয়ম, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যানবাহন ক্রয়ে দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা ও প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যয় অন্যতম। অব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রকল্পের নকশা অনুসারে সুন্দরবনের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব প্রকল্প পরিচালকের কাছে হস্তান্তরে বন বিভাগের অনীহা ও অসহযোগিতার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।

মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সার্বিক বিবেচনায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার কমিটমেন্টের অভাবের কারণে প্রকল্পের নকশাকে অবাস্তব ও অবাস্তবায়নযোগ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রকল্পের নকশা ও পরিকল্পনায় বিভিন্ন ঝুঁকি মোকাবেলায় যথাযথ ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এক্ষেত্রে এডিবি ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত অন্যান্য প্রকল্পের অভিজ্ঞতা যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করা হয়নি বলেও উল্লেখ করা হয়।

প্রকল্পের নকশায় বন বিভাগের কিছু প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত ছিলো যা সুন্দরবনের ব্যবস্থাপনায় বন বিভাগের বাইরের ব্যক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতো। এই প্রসংগে বন বিভাগ ও বন মন্ত্রণালয় শুরু থেকেই নাখোশ থাকলেও প্রকল্প পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নের সময় তার বিরোধিতা করা হয়নি। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করা হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে এবং জীবনযাত্রার সহায়তার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হলেও সুন্দরবনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী তার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যর্থতার কারণ হিসেবে বন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের অসহযোগিতা ও দুর্বৃত্তসুলভ মনোভাবকেও দায়ী করা হয়।

অনুরূপভাবে, বন বিভাগও প্রকল্পের ব্যর্থতার জন্য এডিবিকে দায়ী করে। অপ্রয়োজনীয় ও অদক্ষ পরামর্শক নিয়োগ, এনজিওদের প্রতি অতিমাত্রায় নমনীয়তা, প্রকল্প নকশায় দুর্বলতা বিশেষ করে এডিবি কর্তৃক প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য গুরুত্ব সহকারে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, প্রকল্পের সদর দপ্তর ঢাকায় এডিবি কর্তৃক কার্যকর আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করার পূর্বেই অর্থ ছাড় করা, স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প তদারকি ও পরামর্শ প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না দেওয়া, সুদুর ম্যানিলাস্থ এডিবির সদর দপ্তর হতে প্রকল্পের কাজ পরিচালনা ও তদারকিতে ব্যর্থতা, যেকোনো সময় সিদ্ধান্ত প্রদান এবং পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন, ইত্যাদি কারণে এডিবি প্রকল্পের ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারে না। সরাসরি এডিবি কর্তৃক নিয়োগদানকৃত প্রকল্পের ১৫ জন পরামর্শকের জন্য মাসে ১৫ হাজার মার্কিন ডলার করে বেতন ধরা হয়। অর্থাৎ প্রকল্প থেকে পরামর্শকদের সম্মানী ধরা হয় ৬০ কোটি টাকার বেশি। এছাড়া প্রকল্পের টাকায় ১৮০টি দামী গাড়ি ক্রয় করার পরিকল্পনা ছিল। সে তুলনায় সুন্দরবনের জন্য প্রয়োজনীয় নৌযানের জন্য বরাদ্দ ছিল খুবই কম।[৬৯]

---

[৬৭] OED. Preliminary Findings of the Operations Evaluation Mission on Sunderban Biodiversity Conservation Project. May 2006.

[৬৮] শিশির মোড়ল, 'চার'শ কোটি টাকার বিতর্কিত সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য প্রকল্প বন্ধঃ এডিবি ও সরকার পরস্পরকে দোষারোপ করছে', ফিলিপ গাইন (সম্পাদিত), *বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবনসংগ্রাম*, ২০০৪, পৃষ্ঠাঃ ১৮২।

[৬৯] শিশির মোড়ল, ২০০৪, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৩।

প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালকের মতে পরামর্শকদের কারোরই ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সম্পর্কে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ছিল না। তাদের প্রদত্ত কারিগরি প্রতিবেদনও বন বিভাগের মূল্যায়ন অনুযায়ী অগ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত। এমনকি, পরামর্শক দলের দলনেতা প্রতিবেদন জমা না দিয়েই দেশ ত্যাগ করেন। অথচ তাদের জন্য বরাদ্দ অর্থের অধিকাংশই এডিবি কর্তৃক সরাসরি পরিশোধ করা হয়। প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক আরও অভিযোগ করেন, আর্থিক ব্যবস্থাপনার অসংগতির জন্য বন বিভাগকে দায়ী করা হলেও এজন্য এডিবিই মূলত দায়ী। তিনি বলেন, প্রকল্পটির আর্থিক সুশাসনের জন্য প্রকল্প সদর দপ্তরে একটি সুবিন্যস্ত হিসাব ইউনিট, প্রধান হিসাব সংরক্ষণ কর্মকর্তা এবং অভ্যন্তরীণ হিসাব ব্যবস্থা গড়ে তোলার আগেই অর্থ ছাড় শুরু করা এডিবি'র উচিত হয়নি। প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে উপেক্ষা করে এডিবি প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের পূর্বেই পরামর্শক ফার্ম ও পরামর্শক নিয়োগে প্রাধান্য দিয়েছে। নিয়োগকৃত পরামর্শকদের মধ্যে কোনো আর্থিক হিসাব বিশেষজ্ঞ বা এ বিষয়ক পরামর্শক ছিল না।

৩.১১ বন বিভাগ নিয়ন্ত্রিত বনভূমি জবর দখল

সরকারি বনভূমি সংরক্ষণে বন বিভাগের অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা এবং সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিনিয়ত বনভূমি দখল হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে বন বিভাগের বেদখল হয়ে যাওয়া বনভূমির মোট পরিমাণ ২৭০,৫৭০.৯৮ একর।[৭০]

সারণি ৩.২৮: জবরদখলকৃত বনভূমির পরিমাণ

	হেক্টর	একর
সারা দেশে দখলকৃত জমির পরিমাণ	১,২৭,৬৩৯.৮৯	৩,১৫,৪০১.৬৩
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ	৪,৫৫৪.৩৮	১১,২৫৩.৯৯
২০০৭ এর পূর্বে উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ	১৩,৫৮৮.১৪	৩৩,৫৭৬.৬৬
মোট উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ	১৮,১৪২.৫২	৪৪,৮৩০.৬৫

সূত্র: বন বিভাগ, এপ্রিল ২০০৮।

ভূমিদস্যুতা বা ভূমি দখলের প্রক্রিয়ায় এক শ্রেণীর অসাধু বন কর্মকর্তা-কর্মচারী জড়িত থাকায় বন বিভাগ এই দখলকৃত ভূমির খুব কমই পুনরুদ্ধার করতে পারছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সারাদেশে বনভূমির দায়েরকৃত ভূমি সংক্রান্ত মামলার ৪৯% হচ্ছে কেন্দ্রীয় সার্কেলের আওতাধীন।

সারণি ৩.২৯: ভূমি সংক্রান্ত বন মামলার সংখ্যা

এলাকা	মামলার সংখ্যা	শতকরা হার
কেন্দ্রীয় সার্কেল	১৭৬৪	৪৮.৮৬
সারা দেশে	৩৬১০	১০০

সূত্র: বন বিভাগ, এপ্রিল ২০০৮

দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমি দখলের কারণ ও প্রক্রিয়ায় কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও এক্ষেত্রে সকল স্থানেই বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংশ্লিষ্টতা অন্যতম প্রধান অনুঘটক।

স্টেট অ্যাকুইজিশন এন্ড অ্যাক্ট, ১৯৫০ এর মাধ্যমে জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির পর ভাওয়াল ও মধুপুর গড়ের বনভূমি সরাসরি বন বিভাগের ব্যবস্থাপনার অধীনে আসে। ১৯৫৫ সালে এই বনভূমির কিছু অংশ সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়। তবে এই অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা সংরক্ষিত ঘোষণার প্রক্রিয়ায় বন আইনের ৪ ধারা অনুসারে বিজ্ঞপ্তি জারির পর দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে।

মধুপুর অঞ্চলের বনভূমির গঠন অন্যান্য বনাঞ্চল অপেক্ষা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। অপেক্ষাকৃত উঁচু বনভূমির মাঝেই রয়েছে নিচু সমতল কৃষি ভূমি যা ব্যক্তি মালিকানাধীন। স্থানীয় বন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতায় ব্যক্তি মালিকানাধীন এই সকল কৃষি ভূমির মালিকরা তাদের ভূমি সংলগ্ন বনভূমি অল্প অল্প করে আবাদের মাধ্যমে নিজস্ব ভূমির পরিমাণ বাড়িয়ে নেয়। মূলত বনভূমি দখলের প্রক্রিয়ায় প্রথমে নির্দিষ্ট অংশের গাছ কেটে পাচার করা হয়। পরবর্তীতে মাটি কেটে উঁচু ভূমিকে সমতল ভূমির সমান করে ফেলা হয় যাতে সেই অংশ আলাদাভাবে চিহ্নিত করা না যায়। এরপর নিয়মিত কৃষি কাজের মাধ্যমে জমি দখলের প্রক্রিয়াকে আরও স্থায়ী রূপ দেওয়া হয়। একইভাবে সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জমি দখলের জন্যও প্রথমে সেই অংশের গাছ কেটে পাচার করা হয়। পরবর্তীতে সেই জমিতে স্থানীয় আদিবাসীদের দিয়ে আনারস ও কলা চাষ করা হয়। এভাবে কয়েক

[৭০] বনবিভাগ, ২০০৮। বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

বছর চাষ করার পর সেই জমিকে আর বনভূমির অংশ হিসেবে আলাদা করা যায় না। এরপর ডিসি অফিসের সহায়তায় ভূমিটি সরকারের খাস জমি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা চলে। পরে ডিসি অফিস থেকে খাস ভূমি হিসেবে কোনো ভূমিহীনের নামে বরাদ্দ নেওয়া হয়। দখলকৃত ভূমিতে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভাওয়াল এস্টেট থেকে জমি পত্তনি নেওয়ার জাল কাগজপত্র তৈরি করা হয়। এরপর বন বিভাগ কর্তৃক ভূমি দখলের অভিযোগে মামলা করা হয় এবং আদালতে জাল দলিল বা পত্তনির কাগজপত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে রায়কে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়।

অন্যদিকে স্থানীয় বন কর্মকর্তা যথাসময়ে ভূমি দখলে বাধা না দিয়ে বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পরোক্ষভাবে ভূমি দখলে সহায়তা করে। পরবর্তীতে আদালতে মামলা চলাকালীন যথাযথ প্রমাণ বা কাগজপত্র উপস্থাপন না করার মাধ্যমে আসামিপক্ষকে সহায়তা করে থাকে। মামলার দীর্ঘসূত্রতার সুযোগে অবৈধ দখলদার জমি ভোগ করতে থাকে।

অনেক ক্ষেত্রে দখলকৃত ভূমিতে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার অপর একটি প্রক্রিয়ায় দুইজন ব্যক্তি একই জমির দখলিস্বত্ব দাবি করে একে অপরের বিপক্ষে মামলা করে। এতে দুই ধরনের সুবিধা হয়। প্রথমত, জমির দখলিস্বত্ব বা মালিকানার বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন থাকায় মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কেউ উচ্ছেদ করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, মামলায় যে কোনো একজনের পক্ষে রায় হওয়ায় জমির মালিকানার বিষয়টি কিছুটা পোক্ত হয়। তারপর, দ্রুত এই জমি পরপর কয়েকজনের কাছে বিক্রি করার মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন করা হয়। একই সাথে ভূমি অফিসকে 'ম্যানেজ' করার মাধ্যমে নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করা হয়। পরে বন বিভাগের দায়েরকৃত মামলায় জমির মালিকানার প্রমাণ হিসেবে এই সকল খাজনার রশিদ উপস্থাপন করা হয়।

মধুপুর অঞ্চলে আদিবাসী কোচ এবং মান্দি বা গারোরা বাস করেন। বনভূমি উজাড় এবং সেই ভূমিতে আনারস ও কলা চাষে প্রভাবশালী মহল এই সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করে থাকে। বনভূমি বিরান করার প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ গাছ চুরির ক্ষেত্রেও বাঙ্গালি শ্রমিকের পাশাপাশি আদিবাসীদেরকেও সম্পৃক্ত করা হয়। পরবর্তীতে বনাঞ্চলে আদিবাসীদের ভূমি অধিকারের দাবী তুলে তাদেরকে দিয়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভূমিতেই আনারস ও কলাসহ অন্যান্য সবজী চাষ করা হয়। কিছুদিন পর সুযোগ বুঝে প্রভাবশালী মহল জমির দখল নিয়ে বিভিন্ন অবকাঠামো গড়ে তুলে। স্থানীয় অনেক আদিবাসী নেতাও এইভাবে ভূমি দখল করে পরবর্তীতে বাঙ্গালি প্রভাবশালী মহলের কাছে বিক্রি করে দেয়।

> বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার গাজীপুর ন্যাশনাল পার্ক সংলগ্ন এলাকায় অবৈধভাবে দখলকৃত প্রায় ৬১৮ একর বনভূমির উপর গড়ে উঠা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বৈধতা দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এই এলাকায় মোট ৬৪,০০০ একর বনভূমির মধ্যে ১১,০০০ একর বনভূমি ইতিমধ্যে বনদস্যুরা দখল করে নিয়েছে। বর্তমান আইন অনুযায়ী ন্যাশনাল পার্ক সংলগ্ন এলাকায় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ নিষিদ্ধ। কিন্তু ১৯৮২ সনে ন্যাশনাল পার্ক প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর থেকে এই এলাকায় প্রায় ৩৫০০ বিল্ডিং বা অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের আশংকা, অবৈধ ভাবে গড়ে উঠা কোনো স্থাপনাকে বৈধতা দেয়া হলে, অবশিষ্ট বনভূমি ভূমি দস্যুদের কাছ থেকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।
>
> সূত্র: *দি ডেইলি স্টার*, ২১ জানুয়ারি, ২০০৮।

মধুপুর বনাঞ্চলের শালবন ধ্বংসে এবং এই বনাঞ্চলের ভূমি দখল হয়ে যাওয়ার পিছনে বন বিভাগের উদ্যোগে গ্রহণ করা বিভিন্ন কর্মসূচি এবং বনায়ন প্রকল্পও দায়ী। ১৯৮৬ সনে এখানে ৭৮০০ একর জমিতে সরকারি উদ্যোগে রাবার বাগান গড়ে তোলা হয়। এভাবে শালবন উজাড় করে রাবার বাগান গড়ে তোলার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এই অঞ্চলে। এই সময় প্রভাবশালী মহল রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়ায় রাবার বাগান সংলগ্ন প্রায় ৫০০০ একর জমি দখল করে নেয়। পরবর্তীতে এই সকল বেদখল হয়ে যাওয়া জমিতে থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উডলট ফরেস্টি ও এগ্রো ফরেস্টি মডেলে কৃত্রিম বনায়ন শুরু হয়। মূলত জবর দখলকৃত ভূমিতে এই বনায়ন হওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও, কিছু অসাধু বন কর্মকর্তা-কর্মচারী নতুন করে গজারি বন বিনষ্ট করে বিরান ভূমিতে এই বনায়ন হয়। একইসাথে বিদেশি দাতা সংস্থার পরামর্শে বিদেশি ও আগ্রাসী প্রজাতির বৃক্ষ দিয়ে এখানে বনায়ন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে আবর্তন কাল শেষ হওয়ার পর ক্লিয়ার ফেলিং প্রক্রিয়ায় নিলামে গাছ বিক্রি শুরু হওয়ার পূর্বেই বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতায় শুরু হয় গাছ চুরি।

সামাজিক বনায়নের এক আবর্তনকাল শেষ হওয়ার পর পরবর্তী আবর্তনকাল শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে প্রভাবশালী ভূমিদস্যুর দল স্থানীয় অসাধু বন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তায় সেই বিরান ভূমিতে কলা ও আনারস চাষ শুরু করে। এভাবে ২০০১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিরান বনভূমি ও নতুন করে গজারি বন সাবাড় করে আরও প্রায় ৪৫০০ একর বনভূমি দখল হয়ে যায়। পরবর্তীতে পুনরায় ফরেস্ট্রি সেক্টর প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় বারের মতো উডলট ও এগ্রো ফরেস্ট্রির বাগান গড়ে তুললেও জবর দখল হওয়া ভূমি আর উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তেমনিভাবে, পূর্বের দখল হওয়া জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব না হওয়ায় নতুন নতুন স্থানে বনভূমি দখল করে আনারস ও কলা চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

বনভূমি দখল এবং কলা ও আনারস চাষের বাগান তৈরিতে স্থানীয় বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা থাকে। তাদের ইন্ধন ও সহযোগিতা ছাড়া বনভূমি দখল করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। ভূমি দস্যুতার ধারা ও প্রকৃতি বিবেচনা করলে দেখা যায়, বনাঞ্চলে নতুন করে বনায়ন করতে গেলেই বিশেষ করে দাতা সংস্থার অর্থায়নে কৃত্রিম বন বাগান সৃজনে বন বিভাগের যোগসাজশে প্রভাবশালীরা নতুন করে বন ভূমি জবর দখলের সুযোগ পায়। এতে বন কর্মীদেরও অবৈধ আয় রোজগারের পথ সৃষ্টি হয়।

সারণি ৩.৩০: ভূমি দস্যুতার সহযোগিতায় চাঁদার পরিমাণ

পদবি	**টাকা** (প্রতি একর)
বিট অফিসার	২০,০০০
রেঞ্জ অফিসার	৪০,০০০
ডিএফও	২৫০,০০০

দখলকৃত বনভূমিতে কলা বা আনারস চাষ শুরু হলে কলা বা আনারস সংগ্রহের সময় পুনরায় বন বিভাগের কর্মীরা একর প্রতি ৫ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে। এই টাকা এসিএফ, ডিএফও থেকে শুরু করে বন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পর্যন্ত পেয়ে থাকে। উল্লেখ্য, মধুপুর বনাঞ্চলের মাটি উর্বর হওয়ায় কলা চাষ করে একর প্রতি ৪/৫ লক্ষ টাকা আয় করা যায়। এজন্য প্রভাবশালীরা বনকর্মীদের ম্যানেজ করে বনাঞ্চলের নতুন নতুন এলাকায় কলা চাষ সম্প্রসারণ করে। কলা চাষের দানবীয় আগ্রাসনে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে গজারী বন।

সারণি ৩.৩১: পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ভূমি দখলের পরিমাণ

ক্রমিক নং	এলাকা	রিজার্ভ ফরেস্টের নাম	মোট সংরক্ষিত বনভূমি (বর্গ কি.মি)	বর্তমানে বিদ্যমান বনভূমি (বর্গ কি.মি)	বেদখলকৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গ কি.মি.)
১	**কাপ্তাই**	কেপি রেঞ্জ	২৫.৩৮	২৪.৯৮	০.৪
		কর্ণফুলী রেঞ্জ	৩২.৬৭	২৭	৫.৬৭
		শুভলং রেঞ্জ	২৭	০	২৭
		আলীক্ষিয়ং রেঞ্জ	১৯৫.৫	০	১৯৫.৫
		সাংরা ছড়ি রেঞ্জ	৮৯.৫	৩৫.৮	৫৩.৭
		ফারুয়া রেঞ্জ	১৯০	৪৭.৫	১৪২.৫
২	**বান্দরবান**	থানচি রিজার্ভ ফরেস্ট	৩২৮.৩২	২৪৬.২৪	৮২.০৮
		রোয়াংছড়ি রিজার্ভ ফরেস্ট	৩৬	২৯.৩১	৬.৬৯
		রুমা রিজার্ভ ফরেস্ট	৩০	২২.৫	৭.৫
		বান্দরবান পাল্পউড	৬৯	৫১.৮৪	১৭.১৬
		লামা রিজার্ভ ফরেস্ট	৪১৪.২	৩১০.৬৫	১০৩.৫৫
৩	**খাগড়াছড়ি**	কাছালং রিজার্ভ ফরেস্ট	১৪৪০	৭০০	৭৪০
		উজানি রিজার্ভ ফরেস্ট	২৫০	২৩০	২০
৪	**রাঙ্গামাটি**	খাসখালী রিজার্ভ ফরেস্ট	১৪.৪৩	১৪.৪৩	০
		বেতবুনিয়া রিজার্ভ ফরেস্ট	১১.১৭	১১.১৭	০
		আল্টাছড়ি রিজার্ভ ফরেস্ট	৩০	১৬	১৪
		পাবলাখালি রিজার্ভ ফরেস্ট	৫০	০	৫০
		শীষক রিজার্ভ ফরেস্ট	১৫৮	৯২	৬৬
		মাচালং রিজার্ভ ফরেস্ট	১৩১	১৩১	০
		কাছালং রিজার্ভ ফরেস্ট	৪০	১৭	২৩
		বরকল রিজার্ভ ফরেস্ট	৯	৯	০
	মোট		**৩৫৭১.১৭**	**২০১৬.৪২**	**১৫৫৪.৭৫**
	শতকরা হার		**১০০**	**৫৬.৪৬**	**৪৩.৫৪**

সূত্র: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০০৬।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বনভূমি দখলের অন্যতম প্রধান কারণ স্থানীয় আদিবাসীদের ভূমি অধিকার সংক্রান্ত বিবাদের সুষ্ঠু নিস্পত্তি না হওয়া। আদিবাসীরা দীর্ঘ দিন ধরে এই এলাকায় বসবাস করে আসায় সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় তাদের ভূমি

অধিকার আছে বলে দাবি করে থাকে। ঐতিহ্যগতভাবেই স্থানীয় আদিবাসীরা জুম চাষের সাথে জড়িত। জুম চাষীরা নিয়মিতভাবে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জুম চাষ করে আসছে। জুম চাষের নেতিবাচক প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে বনভূমি উজাড় হয় এবং সেই বিরান বনভূমিতেই দরিদ্র আদিবাসীরা বসতি গড়ে তুলে। সারণি ৩.৩১ এ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ভূমি দখলের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে বসবাসরত আদিবাসীরা বসতি নির্মানের কিছু পরেই সেখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এই সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা 'খেয়্যাং' প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন দাতা সংস্থার আর্থিক সহযোগিতাও পাওয়া যায়। পরবর্তীতে এই সকল অবৈধ বসতি উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় এখন পর্যন্ত কোনো ভূমি জরিপ হয়নি। সিএস জরিপ না হওয়ায় সীমানা নির্ধারণে অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই বন বিভাগের অসাধু কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় বনভূমি দখল করে থাকে। ২০০৬ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট সংরক্ষিত বনভূমির প্রায় ৪৩.৫৪% ভূমি বেদখল হয়ে গেছে বলে উল্লেখ করা হয়।[৭১]

> রাঙ্গামটিতে বাঘাইছড়ি এলাকায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের প্রায় ২০,০০০ একর জমিতে বর্তমান মৌসুমে জুম চাষ করা হচ্ছে। একজন জুম চাষী জানান, জুম চাষ তাদের ঐতিহ্যগত অধিকার। প্রায় পাঁচ একর জমিতে সে এবার জুম চাষ করছে। তার সাথে আরও প্রায় ১০০ জন এবার জুম চাষ করছে। তবে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাস করা বা জুম চাষ করা যে নিষিদ্ধ সে ব্যাপারে অবহিত নয় বলে জানান। বন বিভাগের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেনি বলেও অভিযোগ করেন। সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রায় ৪০,০০০ পরিবার সংরক্ষিত বনের অভ্যন্তরে বসবাস করছে এবং জুম চাষ করছে।
>
> সূত্রঃ *ডেইলি স্টার*, ৫ মে, ২০০৮।

পার্বত্য অঞ্চলে অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তাদের সহায়তায় এই সকল অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন এলাকা প্রথমে খাস জমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরে তা প্রভাবশালী মহলের কাছে অবৈধ আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে লিজ বা ইজারা দিয়ে থাকে।

> রাঙ্গুনিয়া ও কাপ্তাই উপজেলার হোসনাবাদ ইউনিয়নের আওতাভুক্ত রাঙ্গুনিয়া ফরেস্ট রেঞ্জের কোদালা বনবিটের প্রায় ৬৭ একর পাহাড়ি ভূমি অংশীদারিত্বভিত্তিক বনায়নের নামে কোটি কোটি টাকার লেনদেনের বিনিময়ে স্থানীয় কোটিপতি ব্যবসায়ী, ইউপি চেয়ারম্যান, রাজনৈতিক নেতা এবং কিছু সন্ত্রাসীসহ প্রভাবশালী মহলের নামে বরাদ্দ দিয়েছে বন বিভাগ। এই সকল প্রভাবশালী ব্যক্তি বন বিভাগ থেকে এ ভূমি বরাদ্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব ভূমি বা পাহাড় লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে দখলস্বত্ব হস্তান্তর হয়েছে। অংশীদারিত্বভিত্তিক বনায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত ভূমিহীন কিংবা প্রস্তাবিত জায়গার ১ কিমির মধ্যে যাদের বাড়ি আছে অথবা প্রস্তাবিত জায়গা যাদের দখলে আছে এমন ব্যক্তিদের জনপ্রতি ২.৪৭ একর করে ভূমি বরাদ্দ দেওয়ার বিধান আছে। কিন্তু বন বিভাগের কিছু কর্মকর্তা নিয়মনীতি উপেক্ষা করে এলাকার প্রভাবশালীদের নামে ভূমি বরাদ্দ দেয়, যা পরে বরাদ্দপ্রাপ্তরা সীমানা বেড়া দিয়ে দখলস্বত্ব বিক্রি করেছে।
>
> সূত্রঃ *সংবাদ*, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৫

সুন্দরবন সংলগ্ন বন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় কমপক্ষে ২শ' বর্গ কি.মি. বনভূমি বেদখল হয়ে গেছে। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, সুন্দরবন পূর্ব বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের স্টেশন অফিসের সামনে থেকে ভোলা নদীর উত্তর পাড় বেদখল হয়ে গেছে। ভোলা নদী আর খরসা খাল মরে যাওয়ার কারণে সুন্দরবনের মধ্যেই বাড়িঘর নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করা হয়েছে। এরই মধ্যে ওই এলাকার জিউধারা থেকে জয়মনি পর্যন্ত ধানসাগর, বৈদ্যবাড়ি, সুন্দরবন, হোকলাবোনিয়া, কচুবোনিয়া-প্রায় ২০০ বর্গ কি.মি. সুন্দরবন এলাকা স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ভূমি দস্যুরা দখল করে নিয়েছে।

[৭১] পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০০৬।

সুন্দরবন গ্রামের কয়েকজন এই দখল প্রসঙ্গে বলেন, ৫/১০ বছর আগেও এখানে গভীর বন ছিল। নদী মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশে পাশের গ্রামের মানুষ মরা নদীতে ধান চাষ শুরু করে। পরবর্তীতে ওই স্থানে বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা হয়। জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনের সহায়তায় চাঁদপাই রেঞ্জে ধানসাগর আদর্শগ্রাম ও শরণখোলা রেঞ্জে সোনাতলা আদর্শ গ্রামের নামে বনভূমি বিরান করে অবৈধভাবে ভূমি দখল ও বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া শরণখোলা মুক্তিযোদ্ধা পল্লীর নামে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের নাম ব্যবহার করে সংরক্ষিত বনাঞ্চল দখলের পাঁয়তারা করছে।

২০০৪ সালে পরিবেশবাদী সংগঠন 'বেলা' এ বিষয়ে আদালতের আশ্রয় নেওয়ার পর আদালত স্থগিতাদেশ জারি করে। বন বিভাগও কয়েকটি মামলা দায়ের করে। কিন্তু তারপরও বিষয়টির সুরাহা হয়নি। স্থানীয় প্রশাসনের মতে ওই জমি সরকারের খাস খতিয়ানভুক্ত। বন বিভাগের মতে, নদী ভরাট হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক সীমানা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু জমি সুন্দরবনেরই। এখন ওই জমিতে স্থানীয় প্রশাসন গুচ্ছ গ্রাম ও আশ্রয়ণ প্রকল্প তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

লাউয়াছড়ার সংরক্ষিত বনে বন আইন লঙ্ঘন

মার্কিন তেল কোম্পানি শেভরন বাংলাদেশ মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ডের রিজার্ভ সম্পর্কে জানার জন্য লাউয়াছড়া সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও সংলগ্ন এলাকায় ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরিপ কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭৪ এর ধারা ২৩ (৩) অনুসারে যে কোনো সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে এ ধরনের জরিপ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় হতে এই জরিপ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দেওয়া হয়। জরিপের জন্য সাড়ে বারো'শ হেক্টর আয়তনের লাউয়াছড়া বনে প্রতিটি ৭৫ ফুট গভীরতার মোট ১২০০টি গর্ত খুঁড়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বন বিভাগের বন কর্মকর্তার মতে প্রতিটি গর্ত খুঁড়তে গড়ে ২ বর্গমিটার জায়গা প্রয়োজন হলেও বনের মধ্যে মোট প্রায় আড়াই বর্গ কি.মি. জায়গার গাছপালা, লতাগুল্ম নষ্ট হবে। বিস্ফোরণের শব্দে ও ভূ-কম্পনে প্রাণীরা ভীত হয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করবে। এখন বনের গাছপালা ও প্রাণীর প্রজনন মৌসুম হওয়ায় এসব কর্মকান্ডে আরও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। কয়েকজন জরিপ কর্মীর মতে, বনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মারা পড়ছে লাউলতা নামের একটি নিরীহ প্রজাতির সাপ।

সূত্রঃ *প্রথম আলো*, ১২ মে ২০০৮

২০০৪ সালে ইউনোকলকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭৪ ও বন আইন, ১৯২৭ (সংশোধিত ২০০০) লঙ্ঘন করে বন বিভাগ ও পরিবেশবিদদের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ উপেক্ষা করে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সংরক্ষিত বনাঞ্চল লাউয়াছড়ার ভিতর দিয়ে ৩.২ কি.মি. দীর্ঘ গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে। সংরক্ষিত বনের ভিতর দিয়ে এই পাইপ লাইন না নিয়ে, বনের বাইরে দিয়ে বেসরকারি চা বাগান ও কৃষি জমির ভিতর দিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু খরচ বাঁচানোর জন্য ইউনোকল এই লাইন বনের ভিতর দিয়েই নির্মাণ করে। বনের ভিতর এ ধরনের গ্যাস পাইপ লাইনের কারণে গ্যাস লিকেজের ফলে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হওয়া ও বনে আগুন লাগা এবং সর্বোপরি সমগ্র সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ও অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হওয়ার আশংকা রয়েছে।

সূত্রঃ *দি ডেইলি স্টার*, ৫ জানুয়ারি ২০০৫

এছাড়া পূর্ব সুন্দরবনের দুবলা এলাকায় আলোর কোলসহ ১৩টি চর এলাকা একটি প্রভাবশালী মহল দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রেখেছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, দুবলার চর এলাকায় সবজির চাষ করা হয়েছে। পুকুর কেটে পুকুর পাড়ে লাগানো হয়েছে নারকেলসহ কিছু ফলের গাছ। লাঠিসোটা নিয়ে ওই এলাকা প্রভাবশালীদের লোকেরা পাহারা দেয়। কিছু ঘর বাড়িও ওই স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতি বছর অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাছ ধরার মৌসুম। এ সময় বন বিভাগের অনুমতি নিয়ে দুবলা এলাকায় মৎস্যজীবীরা শুটকি উৎপাদন করার জন্যে অবস্থান করে। নিয়ম হচ্ছে, মৌসুম পার হলেই সুন্দরবন ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু আশির দশক থেকে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি মৎস্য ব্যবসায়ীদের একটা সিন্ডিকেট গড়ে তুলে দুবলা এলাকায় বসবাস

করছেন। দুবলা এলাকায় পাঁচটি সাইক্লোন সেন্টার রয়েছে। এই সিন্ডিকেট একটি সাইক্লোন সেন্টারসহ সুন্দরবনের কয়েক'শ হেক্টর জমি দখল করে রেখেছে।

৩.১২ বন নীতি ও বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন

সরকার ও বন বিভাগ অনেকক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত বন আইন, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ আইন এবং বন নীতি উপেক্ষা করে বিদেশী তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানিগুলোকে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনার অনুমতি দিয়ে থাকে। ২০০৪ সালে লাউয়াছড়ার সংরক্ষিত বনে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব উপেক্ষা করে বনের ভিতর দিয়ে গ্যাস পাইপলাইন নেওয়া হয়। গ্যাস পাইপলাইনে কোনো ধরনের দূর্ঘটনা ঘটলে সমগ্র লাউয়াছড়া বনাঞ্চলের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। পুনরায় ২০০৮ সালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় লাউয়াছড়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করে গ্যাস অনুসন্ধানে ত্রিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরিপ পরিচালনার অনুমতি প্রদান করে।

৩.১৩ তথ্য প্রদানে অনীহা ও অসহযোগিতা

বন বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যালয়ে বন বিভাগ সংশ্লিষ্ট কোনো ধরনের তথ্য পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাংবাদিক, বন ও বন বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণায় নিয়োজিত গবেষক ও ছাত্র, লেখক এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য বন বিভাগ থেকে কোনো ধরনের সহায়তা পান না। এক্ষেত্রে যে কোনো তথ্যের জন্যই ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করে বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তাদের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। যে কোনো তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি সংগ্রহের প্রয়োজন হয়।

> বর্তমান গবেষণায় টিআইবি'র পক্ষ থেকে বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বনভূমির আয়তন, বন বিভাগের রাজস্ব আয়ের উৎস, রাজস্ব আয়ের পরিমাণ, মোট জনবল, মোট মামলার সংখ্যা, বনের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন পেশাজীবীর সংখ্যা প্রভৃতি তথ্য জানতে চাওয়ায় মন্ত্রণালয় হতে অনুমতি ব্যতীত তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করা হয়। টিআইবি থেকে মন্ত্রণালয়ে এ সংক্রান্ত অনুমতির জন্য পত্র পাঠানোর প্রায় একমাস পর এ ব্যাপারে জানতে চাওয়ায় প্রেরিত পত্রটি হারিয়ে যাওয়ার কথা জানানো হয় এবং পুনরায় একটি পত্র প্রেরনের অনুরোধ করা হয়। দ্বিতীয় পত্রটি পাঠানোর প্রায় এক মাস পর আংশিক তথ্য পাঠানো হয়।

অনেকের জন্যই দূরত্ব এবং অন্যান্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি সংগ্রহ প্রকারান্তরে এক অসম্ভব ব্যাপার। বন বিভাগের ওয়েবসাইটেও সব ধরনের তথ্য প্রদান করা হয় না এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না। ওয়েবসাইটে বন বিভাগের বনজ সম্পদের উৎপাদনের পরিমাণ ও রাজস্ব আয় সংক্রান্ত সর্বশেষ ২০০৩ সাল পর্যন্ত তথ্য দেওয়া রয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়
উপসংহার

বাংলাদেশ একটি জনবহুল ও দুর্যোগ-প্রবণ দেশ। অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশকে প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার মতো বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। সম্প্রতি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে জলবায়ুর ভারসাম্যহীন পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরও তীব্রতাসম্পন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার নেতিবাচক প্রভাবে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জনপদ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্যদিকে দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার প্রভাবে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া ক্রমশ প্রকটতর হচ্ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। বন ও বৃক্ষ বায়ুমন্ডলের আর্দ্রতা ও তাপের সমতা রক্ষা করে, মাটির ক্ষয় রোধ ও বন্যা প্রতিরোধ করে, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস রোধ করে, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, মরুবিস্তার রোধ করে, বৃষ্টিপাত ঘটায়, পৃথিবীকে বায়ু দূষণ ও শব্দ দূষণ থেকে রক্ষা করে এবং সর্বোপরি প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহায়তা করে। তাই প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ও বনের প্রাণ-সম্পদ পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য।

বাংলাদেশের বনাঞ্চল ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, বনজ সম্পদের টেকসই উন্নয়ন এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব বন বিভাগের হাতে ন্যস্ত। অথচ বন বিভাগের কিছু দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীর অসাধুতা ও সামগ্রিকভাবে বন বিভাগের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণে বাংলাদেশের বন ও বন-নির্ভর জীববৈচিত্র্য আজ বিলীন হওয়ার পথে। মূলত দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূর্বলতা ও সদিচ্ছার অভাবই বন বিভাগে বিদ্যমান অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির জন্য দায়ী। তবে বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নে কার্যকর ও যুগোপযোগী বন নীতির অভাব, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাও এক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে।

সুপারিশমালা

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের আলোকে বিদ্যমান দুর্নীতি ও সংকট দূর করে বন বিভাগকে একটি গতিশীল, কার্যকর, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের জন্য

০১. বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন যে সকল এলাকায় ভূমি দখল হয়ে গেছে এবং দখলের প্রবণতা রয়েছে, সেসকল এলাকায় বনের ভূমি উদ্ধার করে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে 'কম্যুনিটি ফরেস্ট্রি' গড়ে তুলতে হবে।

০২. সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বিদেশি ও দামি কাঠের বৃক্ষ রোপন বন্ধ করে দেশজ, ফলজ ও ঔষধি প্রজাতির বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

০৩. কাঠের চাহিদা পূরণে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরের অংশে, রক্ষিত বনাঞ্চলে এবং অশ্রেণীভুক্ত বনভূমিতে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে বাফার জোন, উডলট ফরেস্ট্রি, এগ্রোফরেস্ট্রি মডেলে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

০৪. সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার জনসাধারণকে বনজ সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যাপক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

০৫. বিকল্প জীবিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন উপজেলা ও জেলা শহরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। সেই সাথে বিভাগীয় শহরে ইপিজেড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানো যেতে পারে।

০৬. বর্তমানে দেশে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে বর্ষাকালে ব্যাপকভাবে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি চালু করতে হবে। প্রয়োজনে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বন বিভাগ এক্ষেত্রে দেশের গণমাধ্যমকে ব্যবহার করতে পারে।

০৭. কাঠের জন্য দেশের বনের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে বিদেশ হতে কাঠ আমদানিতে উৎসাহ ও সহায়তা দিতে হবে।

০৮. রাজস্বমূখী বন নীতির পরিবর্তে সংরক্ষণমূলক বন নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। বাস্তবভিত্তিক ও পরিবেশবান্ধব রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

০৯. রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছা ব্যতীত দেশের অন্যান্য সরকারি কার্যালয়ের মতোই বন বিভাগের দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণে ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ঐকমত্য প্রয়োজন।

সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাস

১০. অন্যান্য সরকারি বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের সাথে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন বিভাগীয় সিদ্ধান্তের কার্যকর বাস্তবায়নে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য বন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোতে 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অব ফরেস্ট' পদটি পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১১. ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট, প্লানিং, এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং শাখা, বন সম্প্রসারণ ও সামাজিক বনায়ন শাখা এবং বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ শাখার জন্য তিনজন পৃথক সিসিএফের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

১২. আইজি অব ফরেস্ট ও সিসিএফ পদসমূহে শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠতার বিচারে পদায়ন বা পদোন্নতি না দিয়ে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্যানেল থেকে সততা, সুনাম ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে হবে।

১৩. বন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোকে পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের দুর্গম স্থানসমূহের ক্যাম্প ও স্টেশনে প্রয়োজনানুযায়ী জনবল বৃদ্ধি করতে হবে।

১৪. বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের 'চলতি দায়িত্ব' না দিয়ে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। বিশেষ করে সিসিএফ পদে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্বে পদোন্নতি দিতে হবে। প্রয়োজনে পদোন্নতির বিদ্যমান নীতি পরিবর্তন করতে হবে।

১৫. বন বিভাগের সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে মন্ত্রণালয় ও সচিবের বিশেষ ভূমিকা থাকে। সুতরাং সকল সিদ্ধান্তের দায়ভারও মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সচিবকে গ্রহণ করতে হবে।

১৬. একই বন বিভাগে দুই বছর এবং একই সার্কেলে তিন বছরের বেশি কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত থাকতে পারবেন না। বদলি হওয়ার ছয় বছরের মধ্যে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পূর্বের কর্মস্থলে পুনরায় নিয়োগ দেওয়া যাবে না।

১৭. নির্দিষ্ট সময় পর পর বন বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যক্তিগত ও পরিবারের সদস্যদের সম্পত্তির হিসাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। প্রয়োজনে দুদক ও এনবিআর কর্তৃক এই প্রতিবেদন যাচাই করতে হবে।

১৮. বন বিভাগের অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে, প্রয়োজনে দ্রুত ট্রাইবুনালের আওতায় তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯. গুরুত্বপূর্ণ বন বিভাগ সংলগ্ন সকল জেলায় বন আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২০. গুরুত্বপূর্ণ বন বিভাগসমূহে বন অপরাধ এবং বনজ দ্রব্য চুরি ও পাচার রোধে বন বিভাগ, পুলিশ, সেনাবাহিনী ও বিডিআর এর সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট সিএফের অধীনে 'জয়েন্ট টাস্কফোর্স' গঠন করতে হবে।

২১. বন আইন অমান্য করে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ১০ কি.মি. এর ভিতরের সকল স'মিল, উড প্রসেসিং মিল এবং ৩ কি.মি. এর ভিতরের সকল ফার্নিচারের দোকান উচ্ছেদ করতে হবে।

২২. সংরক্ষিত বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার সকল অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার কৌশলগত অবস্থানে জয়েন্ট টাস্কফোর্সের ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে ইটভাটায় কাঠের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

২৩. বন বিভাগের নিলামে অংশগ্রহণের জন্য সকল কাঠ ব্যবসায়ীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হতে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। বন অপরাধের কারণে দন্ডিত এবং বন বিভাগের 'অফেন্স রিপোর্ট রেজিস্টারে' তালিকাভুক্ত কোনো ব্যবসায়ী পরবর্তীতে বন বিভাগের কোনো নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না- এ ধরনের নীতি গ্রহণ করতে হবে।

২৪. বন বিভাগের যে কোনো তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে

২৫. বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বাড়াতে হবে।

২৬. মাঠ পর্যায়ে কার্যকর বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় যানবাহন, জ্বালানি তেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অফিস উপকরণ বরাদ্দ করতে হবে।

২৭. আটক বনজ দ্রব্য ও আসামি পরিবহণ, কোর্টে বা থানায় মামলা দায়ের, রিট আবেদনের ক্ষেত্রে আইনজীবী নিয়োগ, বিভিন্ন মামলার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণ ভাতা প্রভৃতি খরচ মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

২৮. সততা, যোগ্যতা ও বিশেষ কর্মদক্ষতার জন্য নিয়মিত পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৯. অবৈধ বনজ দ্রব্য আটকের ক্ষেত্রে উৎসাহ ভাতা বা আটক বনজ দ্রব্যের নির্দিষ্ট অংশ পুরস্কার হিসেবে দিতে হবে।

৩০. নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে দুর্গম স্থানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঝুঁকি ভাতা দিতে হবে।

৩১. বন বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দুর্গম স্থানের স্টেশন, চেকপোস্ট ও ক্যাম্পে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবার সাথে রাখার সুযোগ না থাকায় অতিরিক্ত খরচ করতে হয়। এক্ষেত্রে তাদেরকে বিশেষ ভাতা দিতে হবে।

৩২. অবৈধ বনজ দ্রব্যের পাচার রোধে গোপন সংবাদদাতার জন্য সোর্সমানির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৩. বনরক্ষী হতে রেঞ্জার পর্যন্ত সকলের অফিসিয়াল ইউনিফরম ব্যবহারের নিয়ম কার্যকর করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

৩৪. বনের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বনরক্ষীদের অকেজো অস্ত্রের পরিবর্তে আধুনিক অস্ত্র এবং এগুলো ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৫. বিদেশে বন ও পরিবেশ সংক্রান্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, শিক্ষা সফর ও স্বল্পমেয়াদি কোর্সে বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে মন্ত্রণালয় এবং সচিবালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অপ্রয়োজনীয় প্রমোদ ভ্রমণ বন্ধ করতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১. কানোস্কি, পিটার। ২০০১। প্লান্টেশন ফরেস্টি এট দি মিলেনিয়াম (ফরেস্ট ইন এ ফুল ওয়ার্ল্ড)। ইয়েল ইউনিভার্সিটি। (উদ্ধৃত, গাইন, ফিলিপ। ২০০৫। বিপন্ন বন (বাংলাদেশের বিপন্ন বন)। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা।)

২. গাইন, ফিলিপ। ২০০৪। বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট।

৩. গাইন, ফিলিপ। ২০০৫। বিপন্ন বন (বাংলাদেশের বিপন্ন বন)। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা।

৪. গাইন, ফিলিপ। ২০০৪। দেশীয় প্রজাতির নির্বিচর বিনাশঃ মধুপুর শালবন বিলীন হবার পথে (বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম)। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা।

৫. গাইন, ফিলিপ। ২০০৪। *বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবনসংগ্রাম*। (মোড়ল, শিশির। চার'শ কোটি টাকার বিতর্কিত সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য প্রকল্প বন্ধঃ এডিবি ও সরকার পরস্পরকে দোষারোপ করছে)।

৬. গাইন, ফিলিপ। ২০০৪। বন, বনবিনাশ ও বনভূমিতে বিদেশীপ্রজাতির আগ্রাসন (বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম)। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা।

৭. চক্রবর্তী, তপন। ১৯৯৮। বাংলাদেশের বন ও বনাঞ্চল, বাংলা একাডেমী। ঢাকা।

৮. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। ২০০৫। বন অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সাফল্য।

৯. বাংলাদেশ জেলা গেজেট ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম। ১৯৭৫। ঢাকা।

১০. মজহার, ফরহাদ। ২০০৪। গাছপালা, লতা-গুল্মের ব্যবসা ও রাজনীতি। (বন, বনবিনাশ ও বনবাসীর জীবন সংগ্রাম)। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), ঢাকা।

11. BBS. 2007. http://www.bbs.gov.bd/dataindex/gdp_2006_07.pdf Accessed on 4 May, 2008.
12. BBS, 2007. http://www.bbs.gov.bd/dataindex/census/bang_atg.pdf Accessed on 4 May, 2008.
13. BBS. 1999. Statistical Year Book of Bangladesh. Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, GoB, Dhaka. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.
14. BFD, Ministry of Environment and Forest, FAO and Bangladesh Space Research and Remote Sensing Organization, Ministry of Defence. 2007. *National Forest and Tree Resources Assessment 2005-2007, Bangladesh.* Dhaka.
15. Choudhury, J.K. 'Sustainable management of coastal mangrove forest development and social needs'. Presented in XI World Forestry Congress on 13 to 22 October 1997. Antalya, Turkey.
16. Davidson, J. 2000. Social Forestry in Bangladesh and Socila Forestry Reasearch at the Bangladesh Forest Research Institute. Consultancy Report. ARMP, BFRI, Chittagong. 145pp. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*)http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.
17. Dwivedi, A.P. 1980. *Foreestry in India.* Dehra Dun: Jugal Kishore and Company. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*)http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.
18. Directorate of Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh. 1974. *Working Plan For Chittagong Hill Tracts North Forest Division. For The Years 1969-70 to 1988-89. Vol. I.* Dhaka.
19. Directorate of Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh. 1974. *Working Plan For Chittagong Hill Tracts North Forest Division. For The Years 1969-70 to 1988-89. Vol. I.* Dhaka.
20.
21. FAO. 1993. Forest Resources Assessment 1990: Tropical Countries. FAO Forestry Paper 112, Rome. 44p. (Cited in Haque, N. Depletion of Tropical Forests with Particular Reference to Bangladesh.) htttp://www. eb2000.org/short_note_10.htm Accessed on 24 April 2008.
22. Khan, N.A. 2001. *RETA 5900, Bangladesh Country Case Study* (Final Report). AWFN, ADB, Manila, Philippines. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.
23. Huda, N. and M.K. Roy. 1999. State of the Forests. In : Bangladesh State of Environment Report 1999, edited by Q.I. Chowdhury, 175-190. Dhaka. Forum of Environmental Journalists of Bangladesh. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http:// enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.
24. Forest Resources Management Project (FRMP).1992. *Forest Resources MAnagement Project.* Ministry of Environment and Forest, GoB, Dhaka. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload /371/ attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.

25. Forestry Master Plan (FMP). 1994. *Forestry Master Plan.* Ministry of Environment and Forest, GoB, UNDP/FAO. BGD/88/025, Dhaka. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload /371/attach /08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.
26. Overseas Development Administration (ODA). 1985. *Forest Inventories of Sunderbans: Main Report.* Ministry of Environment and Forest, GoB, Dhaka. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.
27. Kamal, A., M. Kamaluddin, and M. Ullah. 1999. *Land Policies, Land Management and Land Degradation in the HKH Region: Bangladesh Study Report.* ICIMOD, Kathmandu, Nepal. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or. jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_ bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.
28. Khattak, G.M. 1979. History of Forest Management in Bangladesh. *Pakistan Journal of Forestry 29.* (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh. pdf Accessed on 18 March 2008.
29. Forest Department, Government of the People's Republic of Bangladesh. 1973. *Working Plan For Chittagong Hill Tracts South Forest Division. For The Years 1969-70 to 1988-89. Vol. I.* Dhaka.
30. J.M. Cowan. 1923. *Working Plan for the Forests of The Cox's Bazar Division, Bengal.* Calcutta.
31. Forest Department, Government of East Pakistan. 1970. *Working Plan of Sangu and Matamuhuri reserved Forests. For The period from 1967-68 to 1986-87. Vol. I.* Dhaka.
32. Wadud, A.N.M.A. 1989. Need for change in Forest Act 1927. Review Paper No. 111. Institute of Forestry, University of Chittagong, Bangladesh. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371 /attach/ 08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.
33. Sen, K Sumit. 2007. A brief history of the Sundarbans. http://www.kolkatabirds.com/sunderhistory.htm. Accessed on 05 May 2008.
34. Rahman, L.M. 1993. History of Forest Conservation in Indo-Bangladesh. Aranaya 2(2):21-24 (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/ 371/ attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.
35. Hussain, M.M. 1992. Study on National forest Policy in Bangladesh. Mimeo, Forest Department, Dhaka. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.
36. Roy, M.K. 1987. Forest Sector Planning and Development in Bangladesh. Master of Forestry Dissertation, Department of Forestry, Australian National University, Canberra. (Cited in Millat-e-Mustafa, M. 2002. *A Review of Forest Policy Trends in Bangladesh: Bangladesh Forest Policy Trends.*) http://enviroscope.iges.or.jp/ modules/envirolib/upload/371/attach/08_bangladesh.pdf Accessed on 18 March 2008.
37. OED. Preliminary Findings of the Operations Evaluation Mission on Sunderban Biodiversity Conservation Project. May 2006.

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: জবরদখল ও উদ্ধারকৃত বনভূমির পরিমাণ (একরে)

ক্রমিক নং	অঞ্চলের নাম	বন বিভাগের নাম	জেলার নাম	জবরদখলকৃত বনভূমির পরিমান	২০০৭ এর পূর্বে উদ্ধারকৃত ভূমির পরিমাণ	২০০৭ এ উদ্ধারকৃত ভূমির পরিমাণ	মোট উদ্ধারকৃত ভূমির পরিমাণ
১	**কেন্দ্রীয়**	ঢাকা	ঢাকা	৫৮৭.৮৪	-	১২৯.০৩	১২৯.০৩
			গাজীপুর	১৩,১১৩.৯৯	৪,৭৬৪.৫১	১,৩৪৩.৬০	৬,১০৮.১১
		সিলেট	সিলেট	৩২,৩০৩.৩৭	১,৯৭৮.৪৭	২৭৫.০০	২,২৫৩.৪৭
			সুনামগঞ্জ	১৬,৮৩২.৬৮	১২৬.৪১	-	১২৬.৪১
			মৌলভিবাজার	১২,৮৮৯.১৩	৩৬১.০৮	-	৩৬১.০৮
			হবিগঞ্জ	৭১.০১	-	-	-
		টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল	৫৮,২৬৫.৫০	৩,০৬২.৮২	৩,৭০২.০০	৬,৭৬৪.৮২
		ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	২৯,৭৮২.২৭	৪,৩৭৬.৫০	১,৮৩১.৫৭	৬,৩৪২.৭২
			নেত্রকোনা	২৮৪.০৫	৭২.৯০		
			শেরপুর	২,৫৩৬.৩৭	৬১.৭৫		
			জামালপুর	৩,৫০৯.৫৮	-		
২	**উপকূলীয়**	ভোলা	ভোলা	১,০৮৯.৩৭	-	-	-
		পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	৯৬.০০	৬.০০	-	৬.০০
		নোয়াখালী	নোয়াখালী	৫৪,১০৭.৫০	-	৫১০.০৮	৫১০.০৮
			লক্ষ্মীপুর	৭২২.০০	-	-	-
৩	**বগুড়া সামাজিক**	রংপুর	রংপুর	৪৯৩.৪৬	৯৫.০০	৭৯.২৬	১৭৪.২৬
			নিলফামারী	৬৮৫.২১	-	-	-
		রাজশাহী	নঁওগা	৪৪৯.১৯	-	৬০.৫৬	৬০.৫৬
		দিনাজপুর	দিনাজপুর	৪,৪৩৬.৯৯	৬০৭.৬২	৫১.০২	৬৫৮.৬৪
			ঠাঁকুরগাও	৭৯২.৭৭	৩.০১	১৫.৩৬	১৮.৩৭
			পঞ্চগড়	১,৫৪৮.৮৪	-	-	-
৪	**ঢাকা সামাজিক**	কুমিলা	কুমিলা	৬৩৬.৪৭	১১১.৪৯	-	১১১.৪৯
		ফেনী	ফেনী	১০৮.৩১	১০২.৬৭	-	১০২.৬৭
৫	**রাঙ্গামাটি**	পাবর্ত্য চট্টগ্রাম (উ:)	রাঙ্গামাটি	২২.০০	-	-	-
		পাবর্ত্য চট্টগ্রাম (দ:)	রাঙ্গামাটি	৪,৮৪৪.২৩	-	-	-
		ঝুম নিয়ন্ত্রণ	রাঙ্গামাটি	৮,৭০০.২৯	-	-	-
		ইউএসএফ	রাঙ্গামাটি	০.৪০	-	-	-
		বান্দরবান পাল্পউড	বান্দরবান	৪.০০	-	-	-
৬	**চট্টগ্রাম**	চট্টগ্রাম (উ:) বিভাগ	চট্টগ্রাম	২৩,২৯২.৩২	১৪,৯৭৭.৯৩	-	১৪,৯৭৭.৯৩
		চট্টগ্রাম (দ:) বিভাগ	চট্টগ্রাম	৪,৪১৭.৩০	-	-	-
			কক্সবাজার	১,৩৯৪.২৫	-	-	-
		চট্টগ্রাম উপকূলীয়	চট্টগ্রাম	১০,১৩৭.১৬	-	৪২৭.০০	৪২৭.০০
			কক্সবাজার	১৪,৬৩১.৪১	১,০০০.০০	১,৭৮৫.০০	২,৭৮৫.০০
		কক্সবাজার (উ:)	কক্সবাজার	৫,৫৯৯.০০	১,৮০০.০০	৫২৩.৫৭	২,৩২৩.৫৭
		কক্সবাজার (দ:)	কক্সবাজার	৭,০১৭.৩৭	৬৮.৫০	৫২০.৯৪	৫৮৯.৪৪
		মোট (একর)		**৩১৫,৪০১.৬৩**	**৩৩,৫৭৬.৬৬**	**১১,২৫৩.৯৯**	**৪৪,৮৩০.৬৫**
		মোট (হেক্টর)		**১২৭,৬৩৯.৮৯**	**১৩,৫৮৮.১৪**	**৪,৫৫৪.৩৮**	**১৮,১৪২.৫২**

সূত্র: বন বিভাগ, এপ্রিল, ২০০৮।

পরিশিষ্ট ২: সার্কেল অনুযায়ী বিভিন্ন বছরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (টাকা)

ক্রমিক নং	অঞ্চল / সাল	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	২০০৫-২০০৬	২০০৬-২০০৭
১	চট্টগ্রাম সার্কেল	১২৯,০৮৩,০৭১	১১৫,৭৮৬,৫২৮	১৪২,৮২৮,৯৬৫	১৫৭,৫৬৭,৫৬৯	১৪৯,০২৮,৫০৫	১১৭,০৫২,৩৯৫
২	রাঙ্গামাটি সার্কেল	১১৮,০০৪,৭৬৭	১৫৬,৫২২,৫১৪	১৫০,৪৮৭,৭৬৬	২৯৪,৩০৭,৬৩৬	২২৫,২৭৪,২২২	২৪২,৩৮৫,২৬২
৩	ঢাকা কেন্দ্রীয় সার্কেল	৩৪০,৫১৯,৬২১	৩৭১,৪৭৫,৬৮১	৩৯০,৩৩৭,৮৭৩	৩২৭,৪৬৮,০৫২	৪৩৬,০৯২,৭৬০	৯২,২৩৫,২৩৭
৪	খুলনা সার্কেল	৪৫,০৪৬,৪১৭	৭৩,৩৩৬,২৫৯	৬০,৭১৭,৫৩৬	৬৭,২৪৫,৯৯১	৫৮,২১৩,৩৩৩	৬৫,৯২২,২৬৩
৫	উপকূলীয় সার্কেল	৭,৩০০,৭২০	৯,২২৪,২৪৪	১৪,৫৬৬,৫০৭	১০,৪৮৪,১৫২	১৪,৪৭৩,৩০৪	১২,৯৯৩,৮৭২
৬	ঢাকা সামাজিক বনায়ন সার্কেল	১২,৯৯৬,০৫২	৮,২৫৩,৩৪৮	৮,৬৩৫,৩৮৬	১৭,১২১,৩৫৩	২৮,৬৩৪,৪৭৪	২৪,৮৪৯,৬৩৬
৭	যশোর সামাজিক বনায়ন সার্কেল	১৪,৪৮৪,২৮৭	১৩,৫৪৯,৭১৭	১৩,৮৫০,০২৭	১১,৩৯৩,৫২৬	১১,৭১০,৩৫৭	৭,০৬৬,২৭৫
৮	বগুড়া সামাজিক বনায়ন সার্কেল	১৩,১৩০,৫৬৫	২১,৯৩৩,১০০	৬২,৭৮৪,৬৮০	৭১,৬৫৪,৭৭৪	৬৮,৭৪৬,৫১৭	৪৪,৮৯০,৮৩৩
৯	বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সার্কেল	৪,৮৬৫,৫৬১	৪,৭৬১,৬২৬	৭,০১০,৮৭০	৬,৪৭১,১২১	১১,৮৭২,৭৭৫	১৩,৪৩৬,৫০৫
১০	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উইং	৫০,০২৬	২৮০,৫১১	২৬৯,৯৪৩	২৭৭,২৮১	২৭২,০৮২	২৮৯,৭৪৪
১১	পরিকল্পনা উইং	৪৩১,৩৯১	৫৭,৩১৫	৫৯,৩৬২	৬৪,৮১১	৫৮,৩৭৮	৮৫,৫২৮
১২	সদর দপ্তর	২৪৬,০২৯	২৩৪,৯৮৪	৪০৫,১৬৫	২৭৩,৮০০	২৬৬,৩৫২	৩৩২,৮৮৩
	সর্বমোট	**৬৮৬,১৫৮,৫০৭**	**৭৭৫,৪১৫,৮২৭**	**৮৫১,৯৫৪,০৮০**	**৯৬৪,৩৩০,০৬৬**	**১,০০৪,৬৪৩,০৫৯**	**৬২১,৫৪০,৪৩৩**

পরিশিষ্ট ৩: বন বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো